আমরা হীনবীর্য্য কেন?

(শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী)

মনু-ভরদ্বাজ-পরাশরের বংশধর, ধন্বন্তরি-চরক-সুশ্রুতের অনুশাসিত বিধি-নিষেধের নিয়ম প্রতিপালক আমরা হীনবীর্য্য কেন? উষাকালে বৈদিক ছন্দে যাঁহারা সূর্য্যোপস্থান করিতেন, বাল্যে গুরুগৃহে বাস করতঃ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষায় অবহিত থাকিতেন, দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক চিকিৎসা সমভাবে গ্রহণ করিতেন, আমরা তাঁহাদেরই বংশধর, আমরা হীনবীর্য্য কেন?

পুরাকালের মত গুরুগৃহে সে ব্রহ্মচর্য্য নাই সত্য, কিন্তু আধ্যাপকের চতুষ্পাটীতে, নিজেদের গৃহে সে ব্রহ্মচর্য্যের কতকাংশ পালনও কি অসম্ভব? বালক যাহাতে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ পালন করে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাও কি আমাদের পক্ষে কঠিন কার্য্য? উষ্ণবীর্য্য বিদেশীয় ঔষধ খাওয়াইয়া, আসুরিক "ইঞ্জেকসন" দ্বারা জীবন-শক্তি ক্ষয় করিয়া দিয়া, দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক অভ্যুদয়ের দিকে উদাসীন থাকিয়া আমরা কি সন্তান দিগকে হীনবীর্য্য করিয়া দিইনা?

উষাকালে উত্থান যে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক দুইয়েরই পক্ষে উপকারক—তাহা আমরা জানি, তাহা কি কার্য্যে পরিণত করি? সূর্য্যের পানে চাহিয়া প্রত্যহ দুইদণ্ডকাল সন্ধ্যাহ্নিক করার কি ফল—তাহার কি পরীক্ষা করি? প্রাতে পুষ্পচয়নে, প্রভাতী বায়ু সেবনে স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক তৃপ্তি কিরূপ জন্মে, তাহার কি লক্ষ্য করি? আমরা হীনবীর্য্য হইব না ত কাহারা হইবে? শীতপ্রধান দেশে যাহা বিধিবদ্ধ নহে, তাহা আমাদের দেশেও অবশ্য বিধিবদ্ধ হইতে পারিবে না—এ ধারণা কেহ যদি করেন, তিনি ভ্রান্ত।

প্রাতঃসূর্য্য দর্শন যে যাবতীয় রোগ-বীজাণুর নাশক, চক্ষু রোগের পরম রসায়ন,—তাহা সত্য কিনা, শাস্ত্র দেখুন। প্রস্রাবকালে জলশৌচ ব্যবহার না করিলে প্রস্রাব শেষ থাকার কালে মেহাদি রোগের সম্ভাবনা থাকে ইহা অভ্রান্তমত কিনা—আয়ুর্ব্বেদ দেখুন। শঙ্খধ্বনি করা হিতকর, তাহা শুনিয়াছেন। ধুপধুনার গন্ধ দূষিতবাষ্পনাশক, রোগ নিবারক, মশক উপদ্রব দূরকরে কিনা—পরীক্ষা করুন। বিল্বপত্রের গন্ধ স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারক। অমিশ্র জল বহু রোগনাশক। বিল্বপত্রের চর্ব্বণে দুরারোগ্য ব্যাধি দূর হয়, ঐ রস সেবনে ক্ষুধার জয় করা যায়। তুলসী রস শিশুদের পরম রসায়ন, তুলসী বৃক্ষের বাতাস, তুলসীর গন্ধ—ম্যালেরিয়াদি রোগের বীজাণুনাশক। তুলসী পচন্নিবারক গুণবিশিষ্ট। সাধে কি বিল্বপত্র মহাদেবের প্রিয়, তুলসী নারায়ণের প্রিয়। এ সকলের প্রতি সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত।

বাহিরের অশান্ত চঞ্চল তড়িতের সংঘর্ষ হইতে আপনাকে রক্ষা করা প্রয়োজন, সেই রক্ষার পক্ষে মৃগচর্ম্মাসন, কুশাসন প্রভৃতি বিশেষ উপযোগী। পট্টবস্ত্রগরদ তসর প্রভৃতি পরিধান

আবশ্যক। এজন্য পূজা ও জপাদিকালে ঐ আসন ঐ গরদ তসর আদি পরিধানই ব্যবস্থা। এ পরিধানে দেহের শুচিত্ব, চিত্তের প্রসন্নতা, সত্বগুণের বৃদ্ধি হয়।

মৌনী হইয়া খাওয়া, যাহার তাহার হাতে না খাওয়া, গুরু ভোজন না করা—শাস্ত্রের বিধান। ভেজাল দ্রব্য খাওয়া বাজারের লুচী-কচুরী, চপ্-কাটলেট, খাইয়া হাত পা না ধুইয়া যেথানে সেথানে যথন তথন যা তা খাইয়া লোকে নানা রোগে ভুগিতেছে—এ সকল কাহাদের দোষ? এই সকল হীনবীর্য্য করিবার হেতু, নানা রোগের কারণ—ইহার প্রতি অবহিত হওয়া সকলকারই প্রয়োজন, "আদ্র পাদস্ত ভুঞ্জীত" আদ্র পাদ হইয়া ভোজন করিবে, "ভুক্তা রাজবদাচরেৎ" ভোজনের পর রাজার মত পায়চারী করিবে। রাজার মত আরামে বিশ্রাম করিবে,—ইহা মনুর আদেশ।

পশ্চিম ও উত্তরে শয়ন নিষিদ্ধ, এ শয়নে মস্তিষ্ক রসরক্তাদিপূর্ণ, প্রদাহী এবং পীড়িতাবস্থা হইয়া থাকে--এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেছেন। পাপীর স্পৃষ্ট অন্নে, রাখিবার আসনে পাপ হৃদয়ের ছায়াতপ বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণিত করিতেছেন। একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় লঘু ভোজন বা উপবাস প্রশস্ত। ঐ সময়ে দেহের রস বৃদ্ধি হয়—ইহা পরীক্ষিত সত্য। জ্বর বল, বাতাদি রোগ বল, ঐ সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—ইহা সকলেই দেখিয়া থাকেন। উপবাসে অক্ষম ব্যক্তি লঘু ভোজন করিবে—ইহাই ব্যবস্থা।

হীনবীর্য্য হইবার শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের হতাদরই প্রধান হেতু। শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধই আয়ুর্ব্বেদের বিধি নিষেধ। আয়ুর্ব্বেদের বিধি-নিষেধই শাস্ত্রের ভিতর দিয়া আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

হীনবীর্য্য হইবার মুলে ব্রহ্মচর্য্য এবং সংযমের অভাব। বিবাহের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য এক প্রকার। আর বিবাহের পরেও ব্রহ্মচর্য্য আর একপ্রকার। তিথি নক্ষত্র অনুসারে কর্ত্তব্যবোধে ঋতুরক্ষা এক জিনিস, আর অনিয়মিত পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করা অন্য জিনিস। সংসারী সস্ত্রীক ব্যক্তির পক্ষেও আংশিক ব্রহ্মচর্য্য সম্ভব। ব্রহ্মচর্য্যের বা আংশিক ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই যাবতীয় ব্যাধির কারণ। শরীর, মস্তিষ্ক, ইন্দ্রিয় সুস্থ ও সবল থাকিলে রোগের জীবাণু আক্রমণ করিতে পারে না। আহারে বিহারে সর্ব্বত্রই সংযম আবশ্যক।

ব্রহ্মচর্য্য যিনি সম্যক বা আংশিক পালন করেন, আহারে-বিহারে যিনি সংযম রক্ষা করেন, তিনি অরোগী, তিনিই সুখী। ধাতুর বৈষম্যেই ঔষধ সেবন। এ ঔষধ সেবনেও তাঁহার তাদৃশ আবশ্যক করিবেনা। মানব যত্ন করুক, তথাপি যদি রোগের আক্রমন হয় তথনই শাস্ত্রীয় ঔষধ সেবন আবশ্যক।

রোগ নির্ণয়।

[শ্রীভোলাপদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ]

একটা অদ্ভুত রোগের কথাই—
বল্‌বো আমি আজ,
শুনে যিনি হাস্‌বেন তিনি—
নহেন কবিরাজ।
হাস্‌লে হাসতে পারেন বিজ্ঞ—
এম্, বি; এল, এম, এস্।
বাঁধা তাদের ডায়গোনসিস্—
জানা আছে বেশ।
আমারও যে নেহাৎ হাসি—
আসতো তাহা নয়,
পরের রোগটা হতো যদি—
পশ্চাতে বোধ হয়॥
ভোজ্য ছিল চব্য চোষ্য—
তবু শরীর খানি,
দিনে দিনে মলিন হ'ত
কি দুঃখে না জানি।
হজম শক্তি ছিল, হ'ত
কোষ্ঠ পরিষ্কার।
রাত্রিটা তো কাট্‌তো ঘুমে—
(কিছু) নাহি ব্যভিচার।
জরাসুরের রণাঙ্গনে
হয়নি কভু যেতে।
জাগ্‌তে কভু হ'ত নাকো
ডিউটী দিতে রেতে।
তবুও কেন বপু আমার—
শ্রীহীন এমন তর।
অবশেষে শঙ্কা, মনের—
জাগল একটা বড়।
চিকিৎসকের উপদেশটা
নিতে অবশেষে।
এলাম সহর কলিকাতায়—
(যদিও) বৈদ্য ছিল দেশে।
ডাক্তার মিত্র, বসু, বিশ্বাস—
একে, একে, সবে,
বল্লেন,—"তোমার ব্লড্, ইউরিন্—
একজামিন্ যে হবে,
তা'রপর মোরা দেহ তোমার—
মোটা যাতে হয়।
ব্যবস্থাটা সেই রকমই
কর্ব্বো হে নিশ্চয়।
দশটী টাকা আগে ভাগে—
নি'ল হাস্য মুখে,
তাহার সহিত দেহ রক্ত—
দিতে হল দুখে।
ব্যবস্থাটা কল্লেন ভালই—
ত্রিশটী টাকা গেল,
মাস দুই তিন নিউ মেডিসিন্—
উদরস্থ হ'ল।
কিন্তু আমার দেহখানি—
জানিনা বা কেন,
ঔষধ পথ্য রীতিমতই
তবু মলিন যেন।

অবশেষে ভাবলাম মনে
কর্ব্বো ব্যবহার,
আয়ুর্ব্বেদের ছাগলাদ্য—
কিম্বা শক্তিসার।
নন্দীগ্রামের কবিরত্ন—
বয়সে প্রাচীন।
ব্যবস্থাটা তাঁরই দ্বারা—
হ'বে সমীচীন।

*　　*　　*

কবিরত্ন শান্তমনে প্রশ্ন—
ক'রলেন যত,
মনে কি আর আছে সে সব
কত দিন যে গত।
বল্লেন তিনি—"দেহ তোমার—
দেখ্‌তে হ'বে মোরে।
স্নান আহারটা কর এখন—
দে'খব তাহার পরে।
কোন আহার্য্যে প্রীতি তোমার—
বল লজ্জা ছাড়ি,
সাধ্যমত হবে প্রস্তুত,—
(এটা) তোমাদেরই বাড়ী"।
কথাগুলো বল্লেন মোরে—
কতই ভালবাসি—
পিতৃসম, বল্লাম, বিশেষ—
মাংসে অভিলাষী॥

*　　*　　*

এমন রন্ধন খাইনি কখন—
মনের সুখে হায়,
আকণ্ঠ খেলাম মাংস—
আর যে নাহি যায়।

কবিরত্ন বল্লেন এসে—
মৃদুহাস্যে ভাষি।
কুক্কুট মাংস খেলেত খুব
দেখ্‌ছি রাশি রাশি।
পল্লী গ্রামের ব্রাহ্মণ আমি—
বলবো কিবা আর।
পেটের মধ্যে নাড়ী গুলো
হ'ল একাকার।
অন্নাশনের অন্নও বুঝি—
বাহির হ'তে চায়,
জাতটা নিলে এমন বস্তি—
কোথা দেখা যায়।
কবিরত্ন ধীর প্রশান্ত—
বিজয়ীরই মত,
বল্লেন "তোমার দূর হল হে—
ব্যাধি ছিল যত।
রস ধ্বংসী ক্রিমি গুলো—
দেখ হে একবার,
মনের দুঃখে যাদের তুমি—
ক'রলে উদ্‌গার।
এদের তরেই শরীর তোমার—
ছিল এমন ধারা,
সকল চিন্তার হস্ত হ'তে—
পেলে এখন ছাড়া॥"

*　　*　　*

একটা কথা বলে বিদায়—
রোগ চিনিতে যত্ন।
এমনি ভাবে করুন সবে
দেশের ভিষক্‌ রত্ন॥

বেঙ্গল শটী ফুড।

আমাদের "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকায় বেঙ্গল শটী ফুডের বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেকে হয়ত ভাবেন ইহা কি জিনিস। শটী আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রোল্লিখিত এক প্রকার গাছের মূল। আয়ুর্ব্বেদীয় ভাবপ্রকাশ পুস্তকে কর্পূরাদি বর্গে শটীর অশেষ গুণ বর্ণনা আছে। শটী, আদা, আমআদা ও হলুদের ন্যায় মাটীর নিম্নে জন্মে এবং ইহা হইতে পানফলের পালোর ন্যায় পালো প্রস্তুত হয়। বহুকাল হইতে পূর্ব্ববঙ্গের ধনী ও গৃহস্থ ব্যক্তিগণ এই শটীর পালো শিশুর খাদ্য, রোগীর পথ্য এবং বৃদ্ধের লঘু ও পুষ্টিকর আহার্য্যরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদে এরূপ উল্লেখ আছে যে, ইহা ক্রিমি অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময় আমাশয়, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি রোগনাশক। আমরা রোগী ও শিশু-দিগকে বিদেশে প্রস্তুত বার্লি, এরারুট প্রভৃতি খাওয়াইয়া থাকি, কিন্তু শটী এই সকল দ্রব্য অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। বিলাতী বার্লির কৌটা খুলিয়া অনেক সময় দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে পোকা জন্মিয়াছে। এরূপ বার্লি ও এরারুট খাওয়াইলে হিতে বিপরীত হয়, কিন্তু শটী আমাদের দেশে বিশুদ্ধ প্রণালীতে প্রস্তুত এবং তাহা সর্ব্বদাই টাটকা পাওয়া যায়। কলিকাতা ১১৩।১১৪ নং খোংরাপটীর শ্রীযুক্ত অমূল্যধন পাল মহাশয় প্রায় ১৩ বৎসর পূর্ব্বে বেঙ্গল শটীফুড নাম দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশুদ্ধভাবে শটী প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাহা প্রথম প্রচারিত করেন। অধুনা বিচক্ষণ ডাক্তারগণ ও এই শটীফুড্ পরীক্ষা করিয়া ইহার পক্ষপাতী হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইয়াছি যে, গত ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে All India Food Products Exhibitionএও বেঙ্গল শটী ফুড্ পরীক্ষিত হইয়া বার্লি এরারুট অপেক্ষাও ইহাতে জীবন ধারণোপযোগী অধিকতর পুষ্টিকর দ্রব্য আছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই শটীফুড্ দুগ্ধ কিংবা জলের সহিত দশ মিনিট কাল আগুনে পাক করিয়া এবং ইহাতে সামান্য পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে তদ্দ্বারা অনায়াসে জীবন ধারণ করা যায়—The Food itself contains all the most essential constiments of human food and will help the sustanance of life during periods when no other food can be animilated" অর্থাৎ পেটে যখন অন্য কোন জিনিস হজম হয় না, তখন ইহা অনায়াসেই হজম করা যাইতে পারে, এবং মানবের জীবন ধারণোপযোগী যে যে সামগ্রীর প্রয়োজন, ইহাতে তৎসমুদয় বর্ত্তমান আছে। আমাদের দেশে যখন এরূপ বিশুদ্ধ ও উপাদেয় শিশু ও রোগীর খাদ্য রহিয়াছে, তখন আমরা কেন বিদেশীয় পেটেণ্ট ফুডের উপর নির্ভর করি? শটী আমাদের দেশের সম্পত্তি। ইহা দেশবাসীদিগকে বুঝিবার জন্য আমরা পরামর্শ দিতেছি।

নিদান পরিশিষ্টম্

(স্বর্গীয় কবিরাজ হারাধন বিদ্যারত্ন)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:•:—

তৃষ্ণা।

সততং যঃ পিবেদ্বারি ন তৃপ্তিমধিগচ্ছতি।
পুনঃ কাঙ্ক্ষতি তোয়ঞ্চ তং তৃষ্ণার্দ্দিতমাদিশেৎ॥
সংক্ষোভশোকাদতিমদ্যপানা-
দ্রুক্ষাম্লশুষ্কোষ্ণকটূপযোগাৎ।
ধাতুক্ষয়াল্লঙ্ঘনসূর্য্যতাপাৎ
পিত্তঞ্চ বাতশ্চ ভৃশং প্রবৃদ্ধৌ।
জিহ্বাং গলং ক্লোম চ সৌম্যধাতুং
সংশোষ্য নৃণাং কুরুতঃ পিপাসাং॥
তাল্বোষ্ঠকণ্ঠাস্যবিশোষদাহঃ
সন্তাপমোহভ্রমবিপ্রলাপাঃ।
পূর্ব্বাণি রূপাণি ভবন্তি তাসা-
মুৎপত্তিকালেষু বিশেষতো হি॥
নিদ্রানাশো বাতজায়াং মুখশোষঃ শিরোভ্রমঃ।
পীতাক্ষিমূত্রবর্চ্চস্ত্বং পিত্তজায়াং বিনির্দ্দিশেৎ॥
ভক্তদ্বেষঃ প্রসেকশ্চ শিরসো লোঠনং তথা।
কফজায়াং পিপাসাং লিঙ্গমেতদ্বিনির্দ্দিশেৎ॥
ক্ষয়জায়াস্তু হৃৎপীড়া শূন্যতা কম্প এবচ॥
ক্ষীণং বিচিত্তং বধিরং তৃষার্ত্তং
বিবর্জ্জয়েন্নির্গতজিহ্বমাশু॥

মদরোগঃ।

দুর্ব্বলং চেতসঃ স্থানং যদা বায়ুঃ প্রকুপ্যতি।
মনো বিক্ষোভয়েজ্জন্তোঃ সংজ্ঞাং সংমোহয়েত্তদা॥
পিত্তমেবং কফশ্চৈবং মনো বিক্ষোভয়েন্নৃণাং।
সংজ্ঞাং নয়ত্যাকুলতাং বিশেষশ্চাত্র কথ্যতে॥

শক্তানমুক্রতাভাষং বলস্খলিতচেষ্টিতং।
বিদ্যাদ্বাতমদাবিষ্টং রুক্ষশ্যাবারুণাকৃতিং॥
সক্রোধং পরুষাভাষং সংপ্রহারকলিপ্রিয়ং।
বিদ্যাৎ পিত্তমদাবিষ্টং রক্তপীতাসিতাকৃতিং॥
স্বল্পাসম্বদ্ধবচনং নিদ্রালস্যসমন্বিতং।
বিদ্যাৎ কফমদাবিষ্টং পাণ্ডুং প্রধ্যানতৎপরং॥
সর্ব্বাণ্যেতানি লিঙ্গানি সন্নিপাতকৃতে মদে॥

মদাত্যয়ঃ।

বিষস্য যে গুণাঃ প্রোক্তাঃ সন্নিপাতপ্রকোপজাঃ।
ত এব মদ্যে দৃশ্যন্তে বিষে তু বলবত্তরাঃ।
হন্ত্যাশু হি বিষং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্রোগায় কল্পতে।
যথা বিষং তথৈবান্ত্যো জ্ঞেয়ো মদ্যকৃতো মদঃ।
তস্মাত্রিদোষজং লিঙ্গং সর্ব্বত্রাপি মদাত্যয়ে।
দৃশ্যতে রূপবৈষম্যাৎ পৃথক্‌ত্বঞ্চাপি লক্ষ্যতে॥
শরীরদুঃখং বলবৎ প্রমোহো হৃদয়ব্যথা।
অরুচিঃ প্রততং তৃষ্ণা জ্বরঃ শীতোষ্ণলক্ষণঃ।
শিরঃপার্শ্বাস্থিসন্ধীনাং বেদনা বিক্ষতে তথা।
জায়তেঽতিবলা জৃম্ভা স্ফুরণং বেপনং ভ্রমঃ।
উরোবিবন্ধঃ কাসশ্চ শ্বাসো হিক্কা প্রজাগরঃ।
প্রবর্ষণং বিহঙ্গৈশ্চ ভ্রান্তচেতাঃ স মন্যতে।
ব্যাকুলানামশস্তানাং স্বপ্নানাং দর্শনানি চ।
মদাত্যয়স্য রূপাণি সর্ব্বাণ্যেতানি লক্ষয়েৎ॥
স্ত্রীশোকভয়ভারাধ্বকর্ম্মভির্যোঽতিকর্ষিতঃ।
রুক্ষাল্পপ্রমিতাশী চ যঃ পিবত্যতিমাত্রয়া।
রুক্ষং পরিণতং মদ্যং নিশি নিদ্রাং নিহত্য চ।
করোতি তস্য তচ্ছীঘ্রং বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ং॥
তীক্ষ্ণোষ্ণং মদ্যমম্লঞ্চ যোঽতিমাত্রং নিষেবতে।
অম্লোষ্ণতীক্ষ্ণভোজী চ ক্রোধনোঽগ্ন্যাতপপ্রিয়ঃ।
তস্যোপজায়তে পিত্তাদ্বিশেষেণ মদাত্যয়ঃ॥
তরুণং মধুরপ্রায়ং গৌড়ং পৈষ্টিকমেব বা।
মধুরস্নিগ্ধগুর্ব্বাশী যঃ পিবত্যতিমাত্রয়া।

অব্যায়ামদিবাস্বপ্নশয্যাসনসুখে রতঃ।
মদাত্যয়ং কফপ্রায়ং প্রাপ্নোতি স পরং পুমান্॥
বিচ্ছিন্নমদ্যঃ সহসা যোঽতিমাত্রং নিষেবতে।
ধ্বংসকো বিক্ষয়শ্চৈব রোগস্তস্যোপজায়তে॥
শ্লেষ্ম প্রসেকঃ কণ্ঠাস্যশোষঃ শব্দাসহিষ্ণুতা।
মোহস্তন্দ্রাতিযোগশ্চ জ্ঞেয়ং ধ্বংসকলক্ষণং॥
হৃৎকণ্ঠরোগঃ সংমোহশ্ছর্দ্দিরঙ্গরুজো জ্বরঃ।
তৃষ্ণা কাসঃ শিরঃশূলমেতদ্বিলক্ষয়লক্ষণং।
ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য দুশ্চিকিৎস্যতমাবুভৌ॥
নিবৃত্তঃ সর্ব্বমদ্যেভ্যো নরো যঃ স্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শারীরমানসৈর্ধীমান্ বিকারৈর্ন স যুজ্যতে।

উন্মাদঃ।

মোহোদ্বেগৌস্বনঃ শ্রোত্রে গাত্রাণামপকর্ষণং।
অত্যুৎসাহোঽরুচিশ্চান্নে স্বপ্নে কলুষভোজনং।
বায়ুনোন্মথনঞ্চাপি ভ্রমশ্চ ক্রমশস্তথা।
যস্য স্যাদচিরেণৈবমুন্মাদং সোঽধিগচ্ছতি॥

অপস্মারঃ।

স্মৃতির্ভূতার্থবিজ্ঞানমপস্তৎপরিবর্জ্জনে।
অপস্মার ইতি জ্ঞেয়স্ততোঽয়ং ব্যাধিরন্তকৃৎ॥
মিথ্যাদিযোগেন্দ্রিয়ার্থকর্ম্মণামভিসেবনাৎ।
বিরুদ্ধমালনাহারবিহারকুপিতৈর্ম্মলৈঃ।
বেগনিগ্রহশীলানামহিতাশুচিভোজিনাং।
রজস্তমোঽভিভূতানাং গচ্ছতাঞ্চ রজস্বলাং।
তথা কামভয়োদ্বেগক্রোধশোকাদিভির্ভৃশং।
চেতস্যভিহতে পুংসামপস্মারোঽভিজায়তে।
সংজ্ঞাবহেষু স্রোতঃসু দোষব্যাপ্তেষু মানবঃ।
রজস্তমঃপরীতেষু মূঢ়ো ভ্রান্তেন চেতসা।
বিক্ষিপন্ হস্তপাদৌ চ বিজিহ্বভ্রু * বিলোচনঃ †।
দন্তান্ খাদন্ বমন্ ফেনং বিবৃতাক্ষঃ পতেৎ ক্ষিতৌ

---

* বিকৃতজিহ্বভ্রূঃ।
† বিকৃতলোচনঃ।

অল্পকালান্তরঞ্চাপি পুনঃ সংজ্ঞাং লভেত সঃ।
সোঽপস্মারো মহাঘোরো মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ

বাতব্যাধিঃ।

প্রাণোদানসমানাখ্যব্যানাপানৈশ্চ পঞ্চধা।
দেহং তন্ত্রয়তে সম্যক্ স্থানেষব্যাহতশ্চরন্।
স্থানং প্রাণস্য শীর্ষোরোঃকণ্ঠজিহ্বাস্যনাসিকাঃ।
ষ্ঠীবনক্ষবথূদ্গারশ্বাসাহারাদি কর্ম্ম চ॥
উদানস্য পুনঃ স্থানং নাভ্যুরঃ কণ্ঠ এব চ।
বাক্‌প্রবৃত্তিঃ প্রযত্নোর্জ্জো বলবর্ণাদি কর্ম্ম চ॥
স্বেদদোষাম্বুবাহীনি স্রোতাংসি সমধিষ্ঠিতঃ।
অন্তরাগ্নেশ্চ পার্শ্বস্থঃ সমানোঽগ্নিবলপ্রদঃ॥
দেহং ব্যাপ্নোতি সর্ব্বন্তু ব্যানঃ শীঘ্রগতির্নৃণাং।
গতিপ্রসরণাক্ষেপনিমেষাদিক্রিয়ঃ সদা॥
বৃষণৌ বস্তি মেঢ্রঞ্চ নাভ্যূরুবংক্ষণৌ গুদং।
অপানস্থানমত্রস্থঃ শুক্রমূত্রশকৃন্তি সঃ।
সৃজত্যার্ত্তবগর্ভৌ চ যুক্তাঃ স্থানস্থিতাশ্চ তে।
স্বকর্ম্ম কুর্ব্বতে দেহো ধার্য্যতে তৈরনাময়ঃ।
বিমার্গস্থা হ্যযুক্তা বা রোগৈঃ স্বস্থানকর্ম্মজৈঃ।
শরীরং পীড়য়ন্ত্যেতে প্রাণানাশু হরন্তি বা।
সংখ্যামপ্যতিবৃত্তানাং তজ্জানাং হি প্রধানতঃ।
অশীতির্নখভেদাদ্যা রোগাঃ সূত্রে নিদর্শিতাঃ॥
অথ তেষাঞ্চ পঞ্চানামন্যোন্যাবরণং শৃণু।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং শূন্যত্বং জ্ঞাত্বা স্মৃতিবলক্ষয়ং।
ব্যানে প্রাণাবৃতে লিঙ্গং তর্কয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
স্বেদোঽত্যর্থং লোমহর্ষস্ত্বগ্দোষঃ সুপ্তগাত্রতা।
প্রাণে ব্যানাবৃতে লিঙ্গং মুনিভিঃ পরীকীর্ত্তিতং॥
প্রাণাবৃতে সমানে স্যাজ্জড়গদ্গদমূকতা॥
সমানেনাবৃতেঽপানে গ্রহণী পার্শ্ববেদনা।
শূলমামাশয়ে চাপি জায়তে ভৃশদুঃসহং॥
শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ো নিশ্বাসোচ্ছ্বাসসংগ্রহঃ।
হৃদ্রোগো মুখশোষশ্চাপ্যুদানে প্রাণসংবৃতে॥

কর্ম্মজো বলবর্ণানাং নাশো মৃত্যুরথাপিচ ।
উদানেনাবৃতে প্রাণে তং সিঞ্চেৎ শীতবারিণা ॥
ঊর্দ্ধগেনাবৃতেঽপানে চ্ছর্দ্দিশ্বাসাদয়ো গদাঃ ॥
মোহারাগ্নিরতীসারী ঊর্দ্ধগে প্রাণসংবৃতে ॥
ছর্দ্দ্যাধ্মানমুদাবর্ত্তো গুল্মার্ত্তিঃ পরিকর্ত্তিকা ।
লিঙ্গং ব্যানাবৃতেঽপানে জানীয়াৎ কথিতং যথা ॥
অপানেনবৃতে ব্যানে প্রবৃত্তিরধিকং ভবেৎ ॥
মূর্চ্ছা তন্দ্রা প্রলাপাঙ্গসাদোহগ্ন্যোজো বলক্ষয়ঃ ।
সমানেনাবৃতে ব্যানে লক্ষণং সমুদাহৃতং ॥
স্তব্ধতাল্পাগ্নিতা স্বেদশ্চেষ্টাহানির্নিমীলনং ।
উদানেনাবৃতে ব্যানে তত্র পথ্যং মিতং লঘু ॥
পঞ্চান্যোন্যাবৃতানেবং বাতান্ বুধ্যেত লক্ষণৈঃ ॥
জৃম্ভাভিধাতাজ্জন্তোর্হি হনুসন্ধির্বিমুচ্যতে ।
নিরস্তজিহ্বঃ কৃচ্ছ্রেণ ভাষিতং তত্র গচ্ছতি ।
সম্যক্ তমনিলব্যাধিং হনুমোক্ষং বিনির্দ্দিশেৎ ॥

(ক্রমশঃ)

বাতরক্তং ।

উত্তানমথ গম্ভীরং দ্বিবিধং বাতশোণিতং ।
ত্বঙ্মাংসাশ্রয়মুত্তানং গম্ভীরমন্তরাশ্রয়ং ॥
কণ্ডূদাহরুজায়ামতোদস্ফুরণকুঞ্চনৈঃ ।
অন্বিতা শ্যাবরক্তা ত্বকবাহ্যেতাম্রা তথোচ্যতে ॥
গম্ভীরে শ্বয়থুঃ স্তব্ধঃ কঠিনোঽথভৃশার্ত্তিমান্ ।
শ্যাবস্তাম্রোঽথবা দাহতোদস্ফুরণপাকবান্ ।
ভিন্দন্নিবচরত্যস্তে বক্রীকুর্ব্বংশ্চ বেগবান্ ।
করোতি খঞ্জং পঙ্গুং বা শরীরে সর্ব্বতশ্চরন্ ।
সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈশ্চ বিজ্ঞেয়ং বাতাসৃগুভয়াশ্রয়ং ॥

ঊরুস্তম্ভঃ ।

স্নিগ্ধোষ্ণগুরুশীতানি জীর্ণাজীর্ণৈঃ সমশ্নতঃ ।
দ্রবশুষ্কদধিক্ষীরগ্রাম্যানূপোদকামিষৈঃ ।
লঙ্ঘনাধ্যশনায়াসভয়বেগবিধারণৈঃ ।
স্নেহাচ্চামং চিতং কোষ্ঠে বাতাদীন্ মেদসা সহ ।
রুদ্ধা সুগৌরবাদূরু যাত্যধোগৈঃ শিরাদিভিঃ ।

পূরয়েৎ সাস্থিজজ্বোরু দোষো মেদোবলোৎকটঃ।
অবিশেষং পরিস্পন্দং জনয়ত্যল্পবিভ্রমং।
মহাসরসি গম্ভীরে পূর্ণেঽম্বু স্তিমিতং যথা।
তিষ্ঠতি স্থিরমক্ষোভং তদ্বদূরুগতঃ কফঃ।
গৌরবায়াসসংকোচদাহরুক্সুপ্তিকম্পনৈঃ।
সদাহভেদস্ফুরণৈর্যুক্তো দেহং নিহন্ত্যসৌ।
গুরুঃ শ্লেষ্মা সমেদস্কো বাতপিত্তেঽভিভূয়তু।
স্তম্ভয়েৎ স্থৈর্য্যশৈত্যাভ্যামূরুস্তম্ভস্ততোমতঃ॥

শূলরোগঃ।

শঙ্কুস্ফোটনবত্তস্য যস্মাৎতীব্রাশ্চ বেদনাঃ।
শূলাসক্তস্য ভবতি তস্মাচ্ছূলমিহোচ্যতে॥
বাতাত্মকং বস্তিগতং বদন্তি
পিত্তাত্মকঞ্চাপি বদন্তি নাভ্যাং।
হৃৎপার্শ্বকুক্ষৌ কফসন্নিবিষ্টং
সর্ব্বেষু দেশেষু চ সন্নিপাতাৎ॥
বেদনা চ তৃষা মূর্চ্ছা আনাহো গৌরবারুচী।
কাসঃ শ্বাসশ্চ হিক্কাচ শূলস্যোপদ্রবা দশ॥

পরিণামশূলঃ।

বলানঃ প্রচ্যুতঃ স্থানাৎ পিত্তেন সহ মূর্চ্ছিতঃ।
বায়ুমাদায় কুরুতে শূলং জীর্য্যতি ভোজনে *।
কুক্ষৌ জঠরপার্শ্বেষু সর্ব্বেধেতেষু বা পুনঃ।
ভুক্তমাত্রেঽথবা বান্তে জীর্ণান্নে বা প্রশাম্যতি।
ষষ্টিকব্রীহিশালীনামোদনেন প্রবর্দ্ধতে।
পরিণামজশূলোঽয়ং দুর্বিজ্ঞেয়ো মহোদ্গদঃ।
তমাহুর্দুষকং প্রাজ্ঞাঃ স্রোতসাং রসবাহিনাং।
কেচিদন্নদ্রবং প্রাহুরন্যে তং পক্তিদোষতঃ।
পক্তিশূলং বদন্ত্যেকে কেচিদন্নবিদাহজং॥

---

* ভুক্তদ্রব্যে।

উদাবর্ত্তঃ।

আধ্মানশূলৌ হৃদয়োপরোধং
শিরোরুজং শ্বাসমতীব হিক্কাং।
কাসপ্রতিশ্যায়গলগ্রহাংশ্চ
বলাসপিত্তপ্রসরঞ্চ ঘোরং।
কুর্য্যাদপানোঽভিহতঃ স্বমার্গে
হন্যাৎ পুরীষং মুখতঃ ক্ষিপেদ্বা॥
অশ্রুবেগে হৃতে বিদ্যাৎ প্রতিশ্যায়রুচিহৃদ্গ্রহান্॥

গুল্মঃ।

কুপিতানিলমূলত্বাদ্গূঢ়মূলোদয়াদপি।
গুল্মবদ্বা বিশালত্বাৎ গুল্ম ইত্যভিধীয়তে॥
স যস্মাদাত্মনি চয়ং গচ্ছত্যপ্স্বিব বুদ্বুদঃ।
অন্তঃসরতি যস্মাচ্চ ন পাকমুপযাত্যতঃ॥
বিট্শ্লেষ্মপিত্তাতিপরিস্রবাদ্বা
তৈরেব বৃদ্ধৈরতিপীড়নাদ্বা।
ব্যায়ামাদতিসন্তাপাচ্ছীতোষ্ণক্রমসেবনাৎ।
স্বেদবাহীনি দুষ্যন্তি ক্রোধশোকভয়ৈস্তথা।
ততঃ স্বেদঃ প্রবর্ত্তেত দৌর্গন্ধ্যং ঘর্ম্মচর্চ্চিকা।
রাজিকাকৃতিরুক্ষোত্থা যথা ঘর্ম্মবিচর্চ্চিকা।
সেবা রুক্ষান্নপানানাং লঙ্ঘনং প্রমিতাশনং।
ক্রিয়াতিযোগঃ* শোকশ্চ বেগনিদ্রাবিনিগ্রহঃ।
রুক্ষস্যোদ্বর্ত্তনং † স্নানং নস্যং প্রাকৃতিকো জরঃ।
বিকারানুশয়ঃ § ক্রোধাঃ কুর্ব্বন্ত্যতিকৃশং নরং।
প্লীহকাসক্ষয়শ্বাসগুল্মার্শাংস্যুদরাণি চ।
কৃশং প্রায়োঽভিধাবন্তি রোগাশ্চ গ্রহণীগতাঃ।
অত্যন্তগর্হিতাবেতৌ সদাস্থূলকৃশৌ নরৌ।
শ্রেষ্ঠো মধ্যশরীরস্তু কৃশঃ স্থূলাত্তু পূজিতঃ।

---

* বমনবিরেচনাদীনাং পঞ্চকর্ম্মণামতিশয়েন সেবনং।
† উৎপতনং।
§ রোগাণামনুবন্ধঃ।

উদররোগঃ।

অত্যুষ্ণলবণক্ষারবিদাহ্যম্লগরা * শনাৎ।
মিথ্যাসংসর্জ্জনা † দ্রুক্ষবিরুদ্ধাশুচিভোজনাৎ।
প্লীহার্শোগ্রহণীদোষকর্ষণাৎ কর্ম্মবিভ্রমাৎ ‡।
ক্লিষ্টানামপ্রতীকারাৎ রৌক্ষ্যাদ্বেগবিধারণাৎ।
স্রোতসাং দূষণাদামাৎ সংক্ষোভাদতিপূরণাৎ।
অশ্মবালশকৃদ্রোধাদন্ত্রস্ফুটনভেদনাৎ।
অতিসঞ্চিতদোষাণাং পাপ্ম কর্ম্ম চ কুর্ব্বতাং।
উদরাণ্যুপজায়ন্তে মন্দাগ্নীনাং বিশেষতঃ॥
ক্ষুন্নাশঃ স্বাদ্বতিস্নিগ্ধগুর্ব্বন্নং পচ্যতে চিরাৎ।
ভুক্তং বিদহ্যতে সর্ব্বং জীর্ণাজীর্ণং ন বেত্তি চ।
সহতেনাতি সৌহিত্যমীষচ্ছোফশ্চ পাদয়োঃ।
শশ্বদ্বলক্ষয়োঽল্পেঽপি ব্যায়ামেশ্বাসমৃচ্ছতি।
বৃদ্ধিঃ পুরীষনিচয়ে রুক্ষোদাবর্ত্তহেতুকী।
বস্তিসন্ধৌ রুগাধ্মানং বর্দ্ধতে পাট্যতেঽপিচ।
আতন্যতে চ জঠরং লঘ্বল্পৈর্ভোজনৈরপি।
রাজীজন্মবলীনাশ ইতি লিঙ্গং ভবিষ্যতাং॥
রুক্ষাল্পভোজনায়াসবেগোদাবর্ত্তকর্ষণৈঃ।
বায়ুঃ প্রকুপিতঃ কুর্য্যাৎ হৃদ্বস্তিগুদমার্গগঃ।
হত্বাগ্নিং কফমুদ্ধূয় তেন উর্দ্ধগতিস্ততঃ।
আচিনোত্যুদরং জন্তোস্ত্বঙ্মাংসান্তরমাশ্রিতঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণাগ্ন্যাতপসেবনৈঃ।
বিদাহ্যজীর্ণাধ্যশনৈশ্চাশুপিত্তং সমাচিতং।
প্রাপ্যানিলকফৌ রুদ্ধা বেগেন মার্গমাস্থিতং।
নিহন্ত্যামাশয়ে বহ্নিং জনয়ত্যুদরং ততঃ॥
অব্যায়ামদিবাস্বপ্নস্বাদ্বতিস্নিগ্ধশীতলৈঃ।
দধিদুগ্ধৌদকানুপমাংসৈশ্চাপ্যতিসেবিতৈঃ।

---

* গরঃ সংযোগবিষং।

† বমনাদীনাং হীনযোগাৎ।

‡ বমনবিরেচনাদিপঞ্চকর্ম্মণাং বৈদ্যাতুরদোষেণ ব্যভিচারাৎ।

রুদ্ধেন শ্লেষ্মণা স্রোতঃস্বাবৃতেষ্বাবৃতোঽনিলঃ।
তমেব পাতয়ন্ কুর্য্যাদুদরং বহিরস্তগং ॥

বেগৈরুদীর্ণৈর্বিহতৈরধো বা
বাহ্যাভিঘাতৈরতিপীড়নাদ্বা ।
রুক্ষান্নপানৈরতিসেবিতৈর্বা
শোকেন মিথ্যাপ্রতিকর্ম্মণা বা ।
বিচেষ্টিতৈর্বা বিষমাতিমাত্রৈঃ
কোষ্ঠে প্রকোপং সমুপৈতিবায়ুঃ ।
কফঞ্চ পিত্তঞ্চ স দুষ্টবায়ু
রুদ্ধ্বয় মার্গান্ বিনিরুধ্য তাভ্যাং।
হৃন্নাভিপার্শ্বোদরবস্তিশূলং
করোত্যধো যাতি ন বর্দ্ধমার্গঃ ।
পক্কাশয়ে পিত্তকফাশয়ে বা
স্থিতঃ স্বতন্ত্রঃ পরসংশ্রয়ো বা ।
স্পর্শোপলভ্যঃ পরিপীড়িতত্বাৎ
গুল্মো যথা দোষমুপৈতি নাম॥

স্ত্রীণামার্ত্তবজো গুল্মো ন পুংসামুপজায়তে ।
অন্যস্বস্যকৃদ্ভবো গুল্মঃ স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ জায়তে ॥

হৃদ্রোগঃ ।

বিরেকবমিবস্তীনামতিযোগৈর্ভয়েন চ ।
কর্ষণাদভিচারাচ্চ জায়তে হৃদয়াময়ঃ ॥

বৈবর্ণ্যমূর্চ্ছাজ্বরকাসহিক্কা
শ্বাসাস্যবৈরস্যতৃষাপ্রমোহাঃ।
ছর্দ্দিঃ কফোৎক্লেশরুজারুচিশ্চ ।
হৃদ্রোগজাঃ স্যুর্বিবিধাস্তথান্যে ॥

অশ্মরী ।

আমুখাৎ সলিলে ন্যস্তঃ পার্শ্বেভ্য পূর্য্যতে নবঃ ।
ঘটো যথা তথা বিদ্ধি বস্তির্মূত্রেণ পূর্য্যতে ।
এবমেব প্রবেশেন বাতঃ পিত্তং কফোঽপি বা ।

মূত্রযুক্ত উপস্নেহাৎ প্রবিশ্য কুরুতেশ্মরীং
অপ্সু স্বচ্ছাস্বপি যথা নিষিক্তাসু নবে ঘটে।
কালান্তরেণ পঙ্কঃ স্যাদশ্মরীসম্ভবস্তথা।
সংহন্ত্যাপো যথা দিব্যা মারুতোঽগ্নিশ্চ বৈদ্যুতঃ।
তদ্বদ্বলাসং বস্তিস্থমুষ্মা সংহন্তি সানিলঃ॥
যথাস্বং বেদনা বর্ণং দুষ্টং সান্দ্রমথাবিলং।
পূর্ব্বরূপেঽশ্মনঃ কৃচ্ছ্রান্মূত্রং সৃজতি মানবঃ॥

কদম্বপুষ্পাকৃতিরশ্মতুল্যা
শ্লক্ষ্ণা ত্রিপুষ্পপ্যথবাপি মৃদ্বী।
মূত্রস্য চেন্মার্গমুপৈতি রুদ্ধা
মূত্রং রুজং তস্য করোতি বস্তৌ॥

প্রমেহঃ।

কফস্তু বাতপিত্তাভ্যাং মেদসা চ সমন্বিতঃ।
নবীনহায়না*দীনামতিমাত্রনিষেবণাৎ।
কুপিতশ্চোদকাস্থাংশ্চ প্রমেহান্ কুরুতে দশ॥
উষ্ণাম্ললবণক্ষারকটুকাজীর্ণভোজনাৎ।
তীক্ষ্ণাতপাগ্নিসন্তাপশ্রমক্রোধোপসেবিনাং।
বিষমাহারিণাঞ্চৈব ক্ষিপ্রং পিত্তং প্রকুপ্যচ।
বাতেন শ্লেষ্মণা চৈব মেদসা চ সমন্বিতং।
তথাবিধশরীরাণাং মেহমুৎপাদয়েদ্ধি ষট্॥
শিরোবিরেকবমনরেচনাস্থাপনানি চ
ব্যায়ামঞ্চাতিমাত্রেণ সেবমানস্য দেহিনঃ।
বেগসন্ধারণোদ্বেগব্যবায়াভোজনাদপি।
অভিঘাতাচ্চ শোকাচ্চ শোণিতস্যাতিমোক্ষণাৎ।
প্রজাগরাচ্ছরীরস্য বিষমাভ্যাসতস্তথা।
কটুতিক্তকষয়াতিরূক্ষশীতাদিসেবনাৎ।
তথাবিধশরীরাণাং বায়ুঃ কোপমুপেত্য চ।
পিত্তেন শ্লেষ্মণা চাপি বসয়া মেদসান্বিতঃ।
চতুর্বিধানসাধ্যাংশ্চ মেহানুৎপাদয়েদ্ধ্রুবং॥

* হায়নো হায়নকশালিঃ, হৈমন্তিকধান্যবিশেষঃ।

কেশেষু জটিলীভাবঃ সুপ্ততা করপাদয়োঃ ।
শোষঃ কণ্ঠাস্যতালুনামাস্যং চ গুরুগাত্রতা ।
মূত্রস্য শৌক্ল্যং মাধুর্য্যং পৈচ্ছিল্যং বপুষস্তথা ।
রসনাগলতাবঙ্গকায়চ্ছিদ্রে মলোদ্গমঃ ।
পিপীলিকাষট্পদানামগতির্মূত্রদেহয়োঃ ।
শরীরস্যামগন্ধিত্বং * তন্দ্রানিদ্রা চ সর্ব্বদা ।
পূর্ব্বরূপে চ মেহানাং নখানাঞ্চাভিবর্দ্ধনং ॥
মক্ষিকাসর্পণং শ্বাসআলস্যং মাংসসঞ্চয়ঃ ।
প্রতিশ্যায়শ্চ শৈথিল্যং কফজানামুপদ্রবাঃ ॥
পীতবিণ্মূত্রনেত্রত্বং পরিধূমায়নং বমিঃ ।
নিদ্রানাশশ্চ পাণ্ডুত্বং হৃচ্ছূলং পিত্তজন্মনাং ॥
স্তব্ধতা চ শরীরস্য বাতজানামুপদ্রবাঃ ॥
মেদোবসাভ্যামাপন্নশরীরস্য চ মেহিনঃ ।
ত্রিভিদ্রে(র্)ষৈরসৃগতধাতোশ্চ পীড়কা দশ ।
প্রমেহিণো যদা মূত্রমনাবিলমপিচ্ছিলং ।
বিশদং তিক্তকটুকং তদারো গ্যং প্রচক্ষ্যতে ॥
স্বেদদৌর্গন্ধকার্শ্যানি ।

চিকিৎসা-প্রসঙ্গ ।

[কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন]

—— :•: ——

বিশ্ব নিয়ন্তার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশলে জীব সৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার পর জগতে যখন পাপ প্রবেশ করিল, তখন সৃষ্ট জীবের শরীরে রোগও ঢুকিল, দেবতাগণ সে রোগ নিবারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি তাহারই ফল। ব্রহ্মা সে ফল প্রদান করিলেন,

*আমমাংসসদৃশগন্ধঃ ।

ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্র সে ফল লাভ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে লোক হিতবৎসল ঋষিমণ্ডলী ভূলোকে তাহা আনয়ন করিলেন, এমনই করিয়াই মর-জগতে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার হইল।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প জ্যোতিষের প্রথম প্রচার-ভূমি ভারতবর্ষেই এই অমূল্য রত্নের প্রথম প্রকাশ হয়, সমগ্র জগত তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, গ্রীস দেশীয়েরা অধ্যবসায় বলে সে রত্নলাভ করিল, গ্রীস হইতে আরবীয়েরা উহা লাভ করিল, আরব হইতে সমগ্র মেদিনীই উহা প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থমনা হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ রত্ন যাহাদের দ্বারা আবিষ্কৃত হইল, এহেন অমূল্য রত্ন আবিষ্কারের ফলে জ্ঞান গরিমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া একদিন যাঁহারা সমগ্র ভূখণ্ডে অদ্ভুতকর্ম্মা বলিয়া ধন্যমনা হইয়াছিলেন, তাঁহারা এ হেন যশঃ সুরভির মহামূল্য রত্নটী স্বেচ্ছায় চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, নতি, নিমছাল, কালমেঘ, অশোক, গুলঞ্চ, সেফালি, বিল্ব, পারুল প্রভৃতিতে এ রত্নের সমুজ্জ্বল কিরণমালা যে ভারতের কাননে প্রান্তরে, গৃহে, উদ্যানে, পথে, জলাশয়ে প্রতি নিয়ত প্রতিফলিত হইতেছে, এ কথা এই রত্নের অধিকারীরা একেবারেই আর ভাবিয়া দেখিলেন না, আমাদের সম্পত্তি রূপান্তর করিয়া অন্য অন্য দেশবাসীরা যখন আমাদের সম্মুখে ধারণ করিলেন, তখন আমরা আশ্চর্য্যজ্ঞানে সেই দেশবাসীদিগকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলাম। ইহাই হইল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আদিম ও বর্ত্তমান অবস্থা। এই অবস্থান্তরে বৈদ্যের জাতীয় আভিজাত্যেরও অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, সেই কথাটা লইয়াই অদ্য একটু আলোচনা করিব।

কতকগুলি বৃত্তি লইয়া মানবসমাজ গঠিত। তন্মধ্যে চিকিৎসাবৃত্তির মত এরূপ গৌরবের বৃত্তি যে আর নাই, এ কথা খুব জোর করিয়া—বড় গলা করিয়া বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মমূলক বৃত্তিগুলির মধ্যে গুরু, পুরোহিত, শিক্ষক এবং চিকিৎসকের বৃত্তিকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায়, কিন্তু চিকিৎসকের বৃত্তি ইহাঁদের অনেকের উপর। রাজা হউন, জমীদার হউন, হাকিম হউন, উকীল হউন, অর্থে বল, সম্মানে বল, যিনি যতটা বিষয়ের অধিকারী হউন না কেন, সকলকেই চিকিৎসকের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। জীবন-মরণের গুরুদায়িত্বের ভার গ্রহণ কি চিকিৎসকের পক্ষে কম গৌরবের বিষয়? এ ভার তো কাহারও উপর অর্পণ করিবার উপায় নাই। যথেষ্ট অর্থ দিয়াও চিকিৎসকের অনুগ্রহ লাভের জন্য ব্যস্ত হন না—এমন লোক জগতে কয়জন আছেন? জটিল ও উৎকট, কুৎসিত ও কুকর্ম্ম জনিত রোগের রোগী অনেকের নিকট অনেক কথা গোপন করিতে পারে, কিন্তু চিকিৎসকের নিকট সে কথা বলিতেই হইবে, এই জন্য শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন।

"মাতরং পিতরং পুত্রান্ বান্ধবানপি চাতুরঃ
অপ্যেত নভিসঙ্কেত বৈদ্যে বিশ্বাসমেতি চ"

অর্থাৎ রোগীর মাতা, পিতা, বন্ধু সকলের নিকটেই রোগের কথা গোপন করিতে পারে, কিন্তু বৈদ্যের নিকট বিশ্বাস করিয়া সকল কথা বলিয়া থাকে। তাহার জীবন মরণের গুহ্য কাহিনী কাহার নিকট বলিয়া

উহার প্রতিকারার্থ নিশ্চিন্ত, তাহা দেখিয়া তাহার বৃত্তি কতটা উৎকৃষ্ট, তাহা কি আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে? তুমি বৈদ্য হইয়া একথা যদি না বুঝিতে পার, তাহা হইলে তোমার জীবনই বৃথা।

এখন এই জাতীয় একাকারের দিনে, আমাদের অধঃপতিত সমাজে নানাজাতির লোকে চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চিকিৎসা—বৈদ্য জাতিরই কৌলিক বৃত্তি। এই বৃত্তি অবলম্বনের জন্যই বৈদ্যজাতি সমাজে বরেণ্য হইয়াছিল। পক্ষান্তরে শাস্ত্রকুশল এবং স্বধর্মনিষ্ঠ বৈদ্যের তেজস্বীতা—ঐশ্বর্য্যপরায়ণ ব্যক্তির অনুরাগেরও মুখাপেক্ষী নহে। বৃত্তির বিনিময়ে আত্মপরিপোষণের জন্য বৈদ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু যিনি প্রকৃত চিকিৎসক, তাঁহার অর্থের বিনিময়ে গোলামী শিখিবার যো নাই, এ সম্বন্ধে প্রাতঃস্মরণীয় বৈদ্য প্রবর গঙ্গাধরের নামোল্লেখে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে পারা যায়। আত্মমর্য্যাদার হানি হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া একদা তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর একশত টাকার বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পরিশেষে মহারাণী অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া তাঁহাকে বৃত্তি গ্রহণে সম্মত করাইতে পারিয়াছিলেন। এখনকার দিনে যাঁহারা সামান্য অর্থের অনুরোধে আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা যদি এ কথাটী চিন্তা করেন, তাহা হইলে সমাজের অনেক উপকার হইবে।

যা'ক, যা, বলিতেছিলাম, চিকিৎসায় বৈদ্য জাতির যেরূপ গৌরব, এমন আর কিছুতে নহে, কিন্তু এখন বৈদ্যগণ এ বৃত্তি ছাড়িতে বসিয়াছেন। এ বৃত্তিতে অর্থোপার্জ্জনের পথ এখন আর সুগম নহে বলিয়া বৈদ্যদিগের এইরূপ মতি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদের দোষেইতো অর্থোপার্জ্জনের পন্থা রুদ্ধ হইতেছে,—সে কথাটা কি চিন্তা করিবার বিষয় নহে? দেশের চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিবার পদ্ধতি ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহারই অভাবে না এই দুর্গতি! লেখা পড়া শিখিব না, রোগী দেখিয়া চিকিৎসা করিব না, শুধু বিজ্ঞাপনের সাহায্যে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিব, ইহাই হইয়াছে না বর্ত্তমান অবস্থা এবং ইহারই জন্য না আমাদের দুর্গতি হইতেছে! বিজ্ঞাপন দিয়া ঔষধ বিক্রয়ে নির্ভর করা চিকিৎসকের বৃত্তি নহে। যিনি প্রকৃত চিকিৎসক, তিনি এরূপ বৃত্তিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতে যে কিরূপ ব্যয়, তাহা সকলেই জানেন। প্রকৃতপক্ষে সে কালের অপেক্ষা, একালে অন্যান্য দ্রব্যের মত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের উপাদানগুলির মূল্যও অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আগে কবিরাজ মহাশয়েরা যে মূল্যে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিক্রয় করিতেন, এখন বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ী কবিরাজগণ তাহা অপেক্ষা এত কম মূল্যে উহা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত—যে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না। স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতু ঘটিত ঔষধগুলির মূল্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ের স্বর্ণ রৌপ্যাদির মূল্যের তুলনায় কম তো হইতেই পারে না। ঘৃত এবং তৈলাদির মূল্যও যে কি করিয়া কম হয়, তাহাও বুঝি না। ঘৃত-তৈলাদির দর পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে পুরাতন গব্য ঘৃতের স্থলে নূতন এবং ভেজাল ভয়সা ঘৃত ও বিশুদ্ধ

কৃষ্ণ তিলের স্থলে সাদা তিলের তেলের দ্বারা যদি আয়ুর্ব্বেদীয় ঘৃত এবং তৈল প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে তাহার যথেচ্ছা মূল্য করা যাইতে পারে। কিন্তু সেইরূপ উপাদান লইয়া যাঁহারা এই ব্যবসায়ে ব্রতী হন, তাঁহাদিগকে চিকিৎসকের সংজ্ঞা হইতে পৃথক করিয়া কেবলমাত্র ব্যবসায়ী নামে সংজ্ঞা প্রদান করিলেই প্রকৃত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। অনেককাল পূর্ব্বে ত্রিকালদর্শী ঋষিমণ্ডলী দেশে এই শ্রেণীর চিকিৎসকের প্রাদুর্ভাব হইবে বুঝিতে পারিয়া, "ছদ্মচর" বলিয়া তাঁহাদিগকে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা জীবিত থাকিলে এ শ্রেণীর চিকিৎসকদিগকে সেই শ্রেণীতে ফেলিতেন কিনা,তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। ফল কথা, যে সকল কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটিয়াছে, এই শ্রেণীর চিকিৎসকের অভ্যুদয় তাহার অন্যতম কারণ। ইহা ভিন্ন বৈদ্য ছাড়া অন্যান্য জাতিও এইরূপ বিজ্ঞাপনের কুহকে যে দেশ মজাইয়া তুলিয়াছে,—তদ্দ্বারাও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটিতেছে। ইঁহাদের বিজ্ঞাপনের ঘটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কাজেই ইহাদের খরিদ্দারও যথেষ্ট; কিন্তু ব্যবহারে ফল পাওয়া যায় না দেখিয়া দেশের লোকের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উপরে অনুরাগ কমিয়া যাইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ব্যবসায়ে এতাদৃশ পাপের স্রোত বহমান সত্ত্বেও কতকগুলি রোগে ইহা ভিন্ন গত্যন্তর না থাকায় এই চিকিৎসা এখনও দেশ হইতে লোপ পায় নাই। নতুবা অনেক কাল পূর্ব্বেই ইহার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইত। যাহা হউক, দেশের বৈদ্য জাতি যথারীতি শাস্ত্র শিক্ষা পূর্ব্বক দৃষ্টকর্ম্মা হইয়া আবার যদি ইহার উন্নতি কামনায় মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে আবার ইহার উন্নতি হইয়া দেশে আয়ুর্ব্বেদের পূর্ব্ব গৌরব যে উপস্থিত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চাকুরীর মোহে মুহ্যমান হইতেও হয় না, স্বধর্ম্ম মূলক স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনে বৈদ্যজাতি অনায়াসে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানে সক্ষম হইতে পারেন। কিন্তু আবার বলি, এখনকার দিনে শুধু 'নিদান', 'চক্রদত্ত' প্রভৃতি দু'চারিখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া এ ব্যবসায়ে ব্রতী হইলে চলিবে না, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সমাপ্তিপূর্ব্বক তবে এই ব্যবসায়ে ব্রতী হইবে। আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের যোগ্যাকরণ চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ, সেই কথাটী মনে রাখিয়া—যথারীতি আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করিয়া তবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এরূপ ভাবে সকল দিকে জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক যিনি এ ব্যবসায়ে ব্রতী হইবেন, তিনিই ধন্বন্তরিকল্প চিকিৎসক হইয়া এক দিকে স্বকীয় উন্নতি, অপর দিকে বৈদ্যজাতির মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবেন। এরূপ শিক্ষা প্রদানের জন্য দেশের কৃতবিদ্য চিকিৎসকগণের সুমতি হওয়ায়—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে, কিন্তু দেশের বৈদ্যগণ এ সকল কথা একবার ভাবিবেন কি?

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

(কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র গুপ্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ)

আদার রস দুই তোলা এবং মনসাগাছের ছালের রস দুই তোলা, একত্র মিশাইয়া প্রাতঃকালে নিয়মিত সেবনে শ্বাস (হাঁপানি) আরোগ্য হয়।

আমাশয় রোগে শ্বেত আকন্দের মূল চূর্ণ চারি আনা—আমরুল শাকের রস এক তোলা অনুপানের সহিত তিন দিনমাত্র ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়।

জীরা চূর্ণ দুই রতি এবং নাটা করঞ্জের ফলের শাঁস শুষ্ক করিয়া তাহার চূর্ণ ৩ রতি লইয়া জল সহ মাড়িয়া বটী করিবে। উক্ত বটী জ্বরের বিচ্ছেদ অবস্থায় তিন চারিটী মাত্র ব্যবহার করিলে জ্বর বন্ধ হইয়া যায়। দোষের পরিপাকের পর অর্থাৎ আমাবস্থা দূর হইলে উক্ত বটী ব্যবহারে আর জ্বর হয় না। কুইনাইনের পরিবর্ত্তে স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রজঃকৃচ্ছ্রে প্রবল বেদনা উপস্থিত হইলে হীরাকস পাঁচ আনা, মুসব্বর পাঁচ আনা, আফিং চারি আনা এবং বঙ্গভস্ম দুই আনা জলে মাড়িয়া বত্রিশটী বটী করতঃ প্রাতঃকালে এক বটী কর্পূর জলে এবং বেলা চার ঘটিকায় এক বটী কর্পূর জল সহ মাড়িয়া সেবন করিলে বেদনা নষ্ট হয় এবং রজঃস্রাব হয়।

কালা-জ্বর।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)

জ্বর বলিতে যে রোগেকে বুঝায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। একপ্রকার জ্বরকে সাধারণ জ্বর এবং অপর প্রকারকে বিষম জ্বর বলা হয়। জ্বরের ভোগ অনুসারে এই প্রকার জ্বরকে নবজ্বর ও জীর্ণজ্বর ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। সাধারণ জ্বর অনেক সময় বিষম জ্বরে পরিণত হয়, আবার অনেক সময় প্রথম হইতেই বিষম জ্বরে পরিণত হয়। একুশ দিন জ্বর ভোগের পর নিবৃত্তি না পাইলে তাহাকে জীর্ণজ্বর বলা হয়।

সাধারণ জ্বরে দোষ—আমাশকে আশ্রয়

করিয়া এবং বিষমজ্বরকে সপ্ত ধাতুর অন্যতম ধাতুকে আশ্রয় করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সাধারণ জ্বর বিষম জ্বরে পরিণত হয় এবং স্থল বিশেষে প্রথম হইতেই বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে।

দোষোঽল্পহিতসংভূতো জ্বরোৎ সৃষ্টস্য বা পুনঃ।
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষম জ্বরম্॥

অহিত সংভূত অর্থাৎ শরীরের অনিষ্টকর আহার, আচার, কাল, দেশ প্রভৃতির সেবা জন্য দোষের প্রকোপ হইলে সেই দোষ রসাদি সপ্ত ধাতুর অন্যতম ধাতুকে আশ্রয় করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। এখানে প্রথম দোষের প্রকোপ অল্প থাকে, পরে নিদান সেবন জন্য দোষ লব্ধবল হইয়া ঐ জ্বর উৎপাদন করে, এই ভাবে যে জ্বর উৎপন্ন হয় তাহাকে আরম্ভ হইতে বিষম জ্বর বলা হয়। আর একপ্রকার বিষম জ্বর জ্বরোৎ-সৃষ্ট অর্থাৎ যাহাদের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে—তাহাদের যদি দোষ একেবারে প্রকৃতস্থ না হইয়া মৃদুতা প্রাপ্ত হয় এবং রোগী যদি নিদান সেবন করে, তাহা হইলে পূর্ব্ব প্রকারে বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়। এই জ্বর ত্রিসপ্তাহ অতীত হইলে যদি প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে জীর্ণজ্বর বলা হয়।

ত্রিসপ্তাহ ব্যতীতস্তু জ্বরো যস্তনুতাংগত।
প্লীহাগ্নিসাদংকুরুতে সজীর্ণজ্বর উচ্যতে॥

এখন দেখা যাইতেছে যে—

(১) সাধারণ জ্বর বিষম জ্বরে পরিণত হইতে পারে।

(২) আরম্ভ হইতেই বিষম জ্বর হইতে পারে।

(৩) জ্বর উৎপন্ন হইয়া পরে জীর্ণজ্বরে পরিণত হয়।

এতদ্ভিন্ন জ্বরের আর একটী অবস্থা দেখা যায়, তাহা জ্বরের পুনরাবর্ত্তন। জ্বরমুক্ত ব্যক্তিকে সম্যক্ বল লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যায়ামাদি সেবন করা নিষেধ হইয়াছে; সেই গুলি যদি সেবিত হয়, তাহা হইলে এবং দোষ সকল অনুচিত রূপে নিবৃত্ত হইয়া অল্প অপচারেই জ্বর প্রত্যাবৃত্ত হয়।

অসঞ্জাতে বলো যস্তু জ্বর মুক্তো নিষেধতে।
বর্জ্জ্যামেতন্নবস্তস্য পুনরাবর্ত্ততে জ্বরঃ॥
দুষ্কৃতেষু চ দোষেষু যস্য বা বিনিবর্ত্ততে।
স্বল্পে নাপ্যপচারেণ তস্য ব্যবর্ত্ততে পুনঃ॥

কালা-জ্বর বলিতে যে জ্বরকে বুঝায়, তাহা বিষমজ্বরের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমতঃ সাধারণ জ্বর হইয়া পরে বিষমত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, আবার প্রথম হইতেই বিষমজ্বর রূপে দেখা যায়। বিষমজ্বর সন্ততঃ সততক, অন্যেদ্যুঃ, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক ভেদে পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে দোষ—রস ধাতুকে আশ্রয় করিয়া সন্ততঃ রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া সততক, মাংসগত হইয়া অন্যেদ্যু,মেদোগত হইয়া তৃতীয়ক এবং অস্থি ও মজ্জাগত হইয়া চাতুর্থক জ্বর উৎপাদন করে। যেখানে বিষমজ্বর প্রথম হইতেই উৎপন্ন হয়। সেখানে সন্ততাদি অন্যতমরূপে প্রকাশ পায়। সর্ব্বপ্রকার বিষম জ্বরই ত্রিদোষজ। ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ যখন রস ধাতুকে আশ্রয় করিয়া জ্বর উৎপাদন করে' তখন সেই জ্বরকে সন্ততঃ জ্বর বলে। এই জ্বর হইতে নির্দ্দিষ্ট ভোগ পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদী ভাবে থাকে। ত্রিদোষ রক্তধাতুকে আশ্রয় করিয়া সততক জ্বর উৎপাদন করে। এই

জ্বর দিবসে দুইবার বেগ দিয়া আইসে। দিবসে যে কোন্ সময়ে এই দুইবার বেগ হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই, দিনে দুই বার, রাত্রে দুইবার অথবা দিনে একবার ও রাত্রে একবার আসিতে পারে। মাংস ধাতুকে আশ্রয় করায় ত্রিদোষয় যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহার নাম অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর।

এই জ্বর দিবসে একবার আইসে। তৃতীয়ক ও চাতুর্থকভেদে অপর যে দুই প্রকার জ্বর আছে, কালাজ্বর বলিতে যে জ্বর বুঝায় তাহাতে দেখা যায় না, সুতরাং তাহাদের আলোচনা করা অনাবশ্যক।

সাধারণ জ্বর বিষমজ্বরে পরিণত হইয়াই হউক, অথবা আরম্ভ হইতেই বিষম জ্বর উৎপন্ন হউক উহা যে একভাবে থাকে এমন কোন নিয়ম নাই।

ঋত্বহোরাত্র দোষাণাং মনসশ্চ বলাবলাৎ।
কালমর্থবশাশ্চৈব জ্বরস্তং তং প্রপদ্যতে॥

অর্থাৎ ঋতু, দিন, রাত্রি দোষের এবং মনের বলাবল হেতু এবং কর্ম্মবশতঃ এই জ্বর বিভিন্নরূপে পরিণত হয়। যেমন বর্ষাকালে সমুৎপন্ন সন্ততঃ জ্বর শরৎকালে সততক রূপে পরিণত হয়। ঋতু সম্বন্ধে যে প্রকার দেখান হইল এইরূপ সকলগুলির সম্বন্ধেই দেখান যাইতে পারে। জ্বর জীর্ণ হইলে প্লীহা এবং অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়।

বিদাহ্যভিষ্যন্দিরতস্য জন্তোঃ প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্ কফশ্চ। প্লীহাভি বৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ প্লীহোত্থমেতজ্জঠরং বদন্তি॥

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে প্লীহা উৎপন্ন হইলে রক্ত এবং কফ দুষ্ট হয়, প্লীহা রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে মহর্ষি চরক বলেন, "দৌর্ব্বল্য, অরুচি, অবিপাক, মলগ্রহ, মূত্রগ্রহ, তমঃ-প্রবেশন, পিপাসা, অঙ্গসাদ, কাস, শ্বাস, মৃদু-জ্বর, আনাহ, অগ্নিনাশ, কৃশতা, মুখবৈরস্য, পর্ব্বভেদ, কোষ্ঠে বাত বেদনা এবং উদর অরুণ বর্ণ বা গাত্র সমান বর্ণ এবং নীল, হরিৎ বা হরিদ্রাবর্ণ রেখা বিশিষ্ট হয়।

প্লীহা যেমন উদরের বামপার্শ্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দক্ষিণ পার্শ্বেও যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, প্লীহা ও যকৃতের লক্ষণ তুল্যতা এবং চিকিৎসার তুল্যতা বিদ্যমান আছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সন্ততঃ, সততক ও অন্যেদ্যুঃ ইহাদের অন্যতম জ্বর, প্লীহা এবং স্থল বিশেষে যকৃতের বিবৃদ্ধি, পেটের উপর নীল বা হরিদ্বর্ণের শিরারাজি বিদ্যমান থাকে। অধিকন্তু প্লীহা রোগী "কফপিত্তলিঙ্গৈরুপদ্রুত ক্ষীণ বলোঽতি পাণ্ডুঃ" হয়। কফজন্য উপদ্রব রূপে কাস (Bronchitis & Pheumonia) এবং আমাশা (Dysentry) দেখা যায়। পিত্তজনিত উপদ্রবরূপে অতীসার ও স্রোতঃপাক (Cancrune Oris of Necro biosis) দেখা যায়। রোগী পাণ্ডুবর্ণ বিশিষ্ট হয়। পাণ্ডু শব্দের অর্থ ছাইয়ের বর্ণ। প্রথমতঃ রক্তহীনতা নিবন্ধন এইরূপই দেখায়। কিন্তু যখন পিত্ত বিদগ্ধ হয়, তখন হরিদ্বর্ণ ধারণ করে। বিদগ্ধ পিত্ত অম্লরসবিশিষ্ট বলিয়া এবং পাণ্ডুরোগে রক্তের সহিত পিত্ত মিশ্রিত হয় বলিয়া—পিত্তের অম্লরস—রক্তের ক্ষার ধর্ম্মকে কমাইয়া দেয়। কফ ও পিত্ত—দ্রব ধাতু বলিয়া রক্তের সহিত সহজেই মিশ্রিত হইয়া রক্তের দ্রবাংশ বাড়াইয়া দেয়। সেই জন্য যেমন রক্তের ঘনত্ব চলিয়া তদ্রূপ স্বাভাবিক রক্তে যে পরিমাণ শ্বেত ও রক্ত কণিকা

পাওয়া যায়, তাহা আর দেখা যায় না, প্লীহা জন্য মূত্রগ্রহ থাকায় রক্তের দ্রবাংশ বৃদ্ধি এবং রক্তকণার ক্ষয় জন্য রোগীর শরীরস্থ জলীয়াংশ পাদদেশে নিচিত হইয়া শোথরূপে প্রকাশ পায়, ক্রম মধ্যে শোথের সর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। ত্রিদোষ যখন রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া সন্তত: জ্বর উৎপাদন করে, সেই সময় রোগীর গায়ে পীড়কোদগম এবং রক্তনিষ্ঠীবন দেখা যায়।

"রক্তনিষ্ঠীবনং দাহো মেহশর্দ্দন-বিভ্রমৌ।
প্রলাপঃ পীড়কা তৃষ্ণা রক্তপ্রাপ্তেজ্বরে নৃণাম॥

এক্ষণে আমরা কালাজ্বর সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ মতে আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইতেছি

(১) (ক) সাধারণ সন্নিপাত জ্বর বিষম জ্বরে পরিণত হইয়া সন্তত:, সতত এবং অন্যেদ্যু:—ইহাদের অন্যতম রূপে প্রকাশ পাইতে পারে।

(খ) আরম্ভ হইতে সন্তত: জ্বর হইয়া সততক বা অন্যেদ্যু: রূপে পরিণত হয়।

(গ) আরম্ভ হইতে সততক রূপে পরিণত হইতে পারে।

(ঘ) আরম্ভ হইতে অন্যেদ্যু: জ্বর উৎপন্ন হইয়া সন্তত: বা অন্যেদ্যু: রূপে পরিণত হইতে পারে।

(ঙ) এইরূপে উৎপন্ন সকল প্রকার জ্বরই কোন প্রকার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরাবর্ত্তক জ্বররূপে দেখা যায়। ইহার পরে যখন—

(২) প্লীহা দেখা দেয়, তখন স্থল বিশেষে যকৃতও দেখা যাইতে পারে। পিত্তাধিক্য থাকায় জন্য প্লীহা কোমল থাকে এবং কফাধিক্য হইলে উহা কঠিনতা প্রাপ্ত হয়।

(৩) সন্তত: জ্বরে দোষ রসধাতুকে আশ্রয় করে বলিয়া রস দুষ্ট হয়। রস সকল ধাতুর মূল ধাতু; সুতরাং রস দুষ্ট হইলে পরবর্ত্তী ধাতু সকল অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র দুষ্ট হয়। সেই জন্য শরীরের আর সম্যক উন্নতি সাধিত হয় না। রোগী দিন দিন দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে থাকে এবং ক্রমে অবসন্ন প্রাপ্ত হয়।

(৪) যখন দোষ রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া সততক জ্বর রূপে প্রকাশ পায়, সেই সময় রক্তের সহিত পিত্ত ও কফ মিশ্রিত হওয়াতে রক্তের দ্রবাংশ বাড়িয়া যায় বলিয়া রক্তের ঘনত্ব কমিয়া আইসে এবং যে পরিমাণ রক্তে যে পরিমিত শ্বেত ও লোহিত কণা বিদ্যমান থাকে তাহা আর দেখা যায় না। রক্ত ধাতু দুষ্ট হয় বলিয়া তখন পীড়োকোদ্গম Pur puric patch) এবং রক্ত নিষ্ঠীবন দেখা যায়।

(খ) পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া গেলে অম্লতা প্রাপ্ত হয়—যদুক্তং "বিদগ্ধঞ্চাম্লতাং ব্রজেৎ" সুতরাং রক্তের সহিত মিশ্রিত বিদগ্ধ পিত্ত রক্তের ক্ষার ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া দেয়।

(৫) ত্রিদোষ যখন মাংস ধাতুকে আশ্রয় করিয়া অন্যেদ্যুক জ্বর উৎপাদন করে তখন পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং এবং সৃষ্টমূত্র পুরীষতা দেখা যায়। এই দোষ অস্থিকে আশ্রয় করিলে অস্থিভেদ অর্থাৎ অস্থিতে ভগ্নবৎ পীড়া অনুভব হয়।

(৬) প্লীহার রোগী—কফ ও পিত্তজনিত উপদ্রব থাকে বলিয়া কফ জন্য এবং পিত্ত জন্য অতিসার স্রোতঃপাক ইত্যাদি উপস্থিত হয়। পরবর্ত্তী অবস্থা পাণ্ডু এবং পাণ্ডুজন্য রোগীর

গাত্র হরিৎ বা নীলবর্ণ ধারণ করে। ক্রমে রোগীর রক্তহীনতা জন্য শোথ ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়।

ক্রমশঃ

সমালোচনা।

স্ত্রী চিকিৎসা। ডাঃ আর,এল, স্থর এম-ডি প্রণীত, শ্রীরামলাল স্থর কর্ত্তৃক ১০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। এই পুস্তকখানিতে স্ত্রীলোকদিগের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা অতিসুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে এই একখানি মাত্র পুস্তকের সাহায্যে স্ত্রীলোকেরা হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতে পারিবেন। ডাক্তার স্থর অশীতিপর বৃদ্ধ ও প্রাজ্ঞ চিকিৎসক। এই পুস্তকে স্ত্রী চিকিৎসা বিষয়ক যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ তাঁহার অভিজ্ঞতার দৃষ্ট ফল। পল্লীগ্রামে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগেরও এই পুস্তকের দ্বারা উপকার হইতে পারিবে।

Dictionary ডাঃ আর, এল, স্থর এম-ডি প্রণীত। ৪র্থ সংস্করণ। মূল্য ২৲ স্থলে ১॥০ টাকা। ইহা একখানি ডাক্তারি অভিধান। ইহাতে মোটামুটি ডাক্তারী শব্দের দুরূহ ব্যাখ্যা সকল ল্যাটিন, বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তকের দ্বারা ডাক্তারী ছাত্রগণ অনেক উপকার পাইবেন।

মূত্র পরীক্ষা। ডাঃ শ্রীমান্ আনন্দমোহন স্থর প্রণীত। মূল্য ৶০আনা মাত্র। খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছে। শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,শ্যামুয়েল এণ্ড কোং হইতে প্রকাশিত। মূত্র পরীক্ষার বিষয় অতি সুন্দর ভাবে সহজ কথায় ইহাতে লিখিত হইতেছে। পল্লীগ্রামের চিকিৎসকগণ এই পুস্তকের দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাইবেন। আমরা ইহার দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।

কদলীর উপকারিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।)

১২। চিনি চাঁপা—একপ্রকার চাঁপা কলা, পূর্ব্বোক্ত চাঁপা অপেক্ষা অধিক মধুর ও সুতার।

১৩। গিরী কদলী—মধুর, হিম, বলবীর্য্য বৃদ্ধিকারক তৃষ্ণা, পিত্ত দাহ ও শোষনাশক।

১৪। ঠোটে কলা—ছোট ছোট কলা, ঘোর সবুজ বর্ণ, পাকিলে অধিক সুমিষ্ট।

১৫। জিনকলা—ইহার অপর নাম ঠোটে বা লম্বির কলা, গোপীকলা ইত্যাদি।

১৬। কাচা কলা—ত্রিপুরা শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাকে কুড়োকাঠালি, ডিঙ্গামাণিক, পান্তরস, বগুনা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ইহা কেবল কাঁচা অবস্থায় ভুক্ত হয়, ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও একটী প্রধান তরকারী, বিশেষতঃ কাচা কলা বিশেষ পুষ্টিকর, ধাতু বর্দ্ধক, উদরাময়ে পথ্য। ইহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে লৌহের গুণ আছে।

১৭। ডোগরে কলা—কলিকাতার নিকটে জন্মে, পাকিলে এত বীজ হয় যে, খাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার মোচা সুস্বাদু, মোচার জন্যই চাষ করা হয়।

১৮। ঝামা কলা—বীচিভরা ঐ জন্য মানুষের খাদ্য মধ্যে প্রিয় নহে। ইহার পাতা, মোচা, থোড়, খোলা ইত্যাদি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। ফলগুলি গোজাতির খাদ্য।

১৯। দয়া কলা—ঝামাবসনা (বহু বীচি যুক্ত), শবরীকলা, জিন বা লম্বির কলা—(ইহাকে ঠোটে কলাও কহে) অধিক। তবে স্থানে স্থানে চিনি টোপা নামে একরূপ বড় বড় কলা আছে। ইহা পূর্ব্ববঙ্গে আবাদ হয়।

২০। সোনা কলা—দেখিতে ঠিক কাঁচা সোণার রং, মর্ত্তমানের জাতীয়, (বোম্বায়ে জন্মে)।

২১। বীচা কলা প্রথমে কাঁচা কলার মত দেখিতে, পাকিলে লালের আভাযুক্ত হলুদ রং হয়, বীচিতে পরিপূর্ণ, বীচি বাছিয়া খাইলে শাঁস অতীব সুমিষ্ট, পাড়া গাঁয়ে স্ত্রীলোকেরা ইহা বড় ভাল বাসে।

২২। অগ্নীশ্বর—লাল রং ওজনে প্রায় ৩ ছটাক গরম ভাতে ডবাইয়া রাখিলে ঘৃতের মত গলিয়া যায় ইহা অত্যন্ত সুস্বাদু।

২৩। ক্ষিত্র—ইহাও অগ্নীশ্বরের তুল্য গুণও তুল্যস্বাদ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত একটু ছোট।

২৪। অনুপাম—মর্ত্তমান কলার জাতীয়, খাইতে বেশ সুস্বাদু।

২৫। বত্রিশছড়ী—বাঁকুড়া জেলায় জন্মে এক কাঁদিতে ঠিক বত্রিশ ছড়া কলা জন্মে, (চাঁপাকলার জাতীয়)।

২৬। শিঙ্গাপুরী—শিঙ্গাপুর হইতে আসে বড় বড় কলা হয়, পাকিলেও দেখিতে সবুজ, কিন্তু ভিতরে মোলায়ম ও সুস্বাদু।

২৭। মোহন বাঁশী—ইহা বিদেশী দ্রব্য ইহার অপর নাম কানাই বাঁশী। পেশোয়ার কাশ্মীর এবং পশ্চিম ভারত হইতে এই কলা আসিয়া বঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা খাইতে অম্ল মধুর প্রায় এক হাত লম্বা হয় কিন্তু সরু বেশ হরিদ্রাবর্ণ, এই শ্রেণীর কালার সাধারণ নিয়ম এই যে ইহার বাকলা বড় পাতলা এবং পাকিলে কাল হইয়া যায়।

২৮। নদনা—কাঁঠালী কলারই জাতীয় অপেক্ষাকৃত একটু বড়।

২৯। তুলসী কলা—ছোট ছোট কলা হয়, বেশ সুস্বাদু ও সুগন্ধিন পশ্চিম দেশে পাওয়া যায়।

৩০। দয়ে কলা—যশোহর জেলায় জন্মে, ইহা এক প্রকার বীজ কলা, কিন্তু শাঁশ টুকু অতি মিষ্ট নরম ও সু-তার, চিনি সহ জলে গুলিলে অতি উত্তম সরবৎ প্রস্তুত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ

৮ম বর্ষ	ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩০ সাল।	৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

চিকিৎসায় রসৌষধ।

[কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ধাতব ঔষধ ব্যবহার করিবার পক্ষে একটু মুস্কিল আছে। যদিও লোকে কথায় বলে "লোহা খাইয়া হজম করিতে পারি",—তথাপি জীবের পরিপাক-যন্ত্রের এমন কোন শক্তি নাই—যাহা দ্বারা ধাতব পদার্থ সকল সে অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারে। এইজন্য ধাতব পদার্থ সকলকে ঔষধে ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে জীব-শরীরের উপর কার্য্য করিবার উপযোগী করিয়া লইতে হয়। ঔষধে জীবন্যাস করিবার একটী প্রথা বিদ্যমান আছে। আজ যদিও উহা মাত্র একটী মন্ত্র উচ্চারণে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তথাপি উহার একটী নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান আছে। জান্ত মৌদ্ভিদ দ্রব্য সকল স্বভাবতঃই জীবন জন্য ইহারা সেবিত হইলে জীবের পরিপাক শক্তির প্রভাবে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রক্ষণ ও বর্দ্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, কিন্তু ধাতব পদার্থগুলি তদ্ধর্ম্ম বিশিষ্ট নহে। যদিও পাচক রসের প্রভাবে তাহাদের দুই একটী জীব-শরীরে কার্য্য করিবার উপযোগী হয়, তথাপি তাহাদের অধিকাংশই অবিকৃতাবস্থায় মলের সহিত বহির্গত হইয়া যায়। পরন্তু গুরু পদার্থ সকল পরিপাক যন্ত্রের ভিতর থাকিলে নানাপ্রকার অনর্থ সংঘটিত হয়। এই সকল কারণে ধাতব ঔষধ সকলের জীবন্যাস করিয়া ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। জীবন্যাস শব্দের অর্থ এই যে, যুক্তি ও ক্রিয়া দ্বারা দ্রব্যকে জীব-শরীরে কার্য্য করিবার উপযোগী করিয়া লওয়া।

ধাতব পদার্থ সকলকে জীব-শরীরের উপযোগী করিয়া লইতে হইলে প্রথমতঃ তাহার দোষ দূর করিয়া লইতে হয়। এই দোষ দুই প্রকারের। এক, দ্রব্যের স্বাভাবিক দোষ, অপর সংসর্গজ দোষ। স্বাভাবিক দোষ যুক্ত দ্রব্য জীব শরীরে প্রযুক্ত হইলে শরীরের অনিষ্ট সাধন করে, আর সংসর্গজ দোষ জন্য তাহার সহিত অপর জিনিসের সংমিশ্রণ থাকে বলিয়া তাহাদের দ্বারাও শরীরের অপকার সাধিত হয়। দ্রব্যের স্বাভাবিক ও সংসর্গজ দোষ জন্যই শোধনের ব্যবস্থা। শোধনানন্তর সেই দ্রব্য প্রযুক্ত হইলে, শোধনের পূর্ব্বে তাহা দ্বারা যে অপকারের সম্ভাবনা ছিল, তাহা আর থাকিবে না। পরন্তু ভেষজ সংস্কার জন্য তাহায় শক্ত্যুৎকর্ষ সাধিত হইবে।

যে সকল দ্রব্য পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্যে শরীরে বিশেষ বিশেষ কার্য্য করিবার উপযোগী হয়, তাহাদিগকে শোধন করিয়াই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এমন কতকগুলি দ্রব্য আছে যে, শোধন-ক্রিয়া করিলেও তাহা শরীরের কার্য্যোপযোগী হয় না। এইজন্য তাহাদিগের জারণ ক্রিয়া করিতে হয়। জারণ ক্রিয়ার ফলে দ্রব্যগুলি অতি সূক্ষ্ম চূর্ণরূপে পরিণত হইয়া বারিতর হয়, এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়ে। বারিতর শব্দের অর্থ এই যে "মৃতং তরতি যত্তোয়ে লৌহং বারিতরং হি তৎ—" অর্থাৎ যে মৃতধাতু (ধাতুভস্ম) জলের উপর ভাসিতে থাকে, তাহাকে বারিতর কহে।

এইরূপ অবস্থায় ঐ সকল দ্রব্য পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যে জীবদেহে কার্য্য করিবার উপযোগী হয়। একটী প্রবাদ আছে, 'স্বভাব যায় না মলেও"। যদিও দ্রব্যগুলি জীবদেহে কার্য্য করিবার উপযোগী হয়, তথাপি জীবদেহে অপকার করিবার শক্তিও তাহাদের থাকিয়া যায়। সেই সকল দোষ দূর করিবার জন্য দ্রব্যগুলির অমৃতীকরণ করিয়া লইতে হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, শোধিত, জারিত এবং অমৃতীকৃত ধাতব ঔষধগুলি জীবদেহে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান। রোগ নাশার্থে ইহাদের অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হয় না। সামান্য ২।১ রতি পরিমিত মাত্রাতেই কার্য্য সিদ্ধি হয়, সুতরাং এই সকল ঔষধ সেবনে বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না, পরন্তু সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োগ করা চলে। যেখানে রোগী রোগ যন্ত্রণায় অচৈতন্য বা অভিভূত হইয়া থাকে, সেই রূপ অবস্থায়ও এই সকল ঔষধ কোন ক্রমে প্রবেশ করাইতে পারিলেই তাহা উদরস্থ হইয়া কার্য্যকারী হয়। এই সকল ঔষধে ষড়রসের মধ্যে কোন প্রকার রসের উদ্ভূতত্ব না থাকায় ঔষধ সেবনে রোগী কোন কষ্ট অনুভব করে না; সুতরাং কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি রসবিশিষ্ট ঔষধ সেবনের জন্য অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ আইসে না। আহারে রুচি অব্যাহত থাকায় রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না বলিয়া শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে। অধিকন্তু কাষ্ঠৌষধ অপেক্ষা রসৌষধ শক্ত্যাধিক্য বশতঃ উহা দ্বারা সত্বরই সুফল পাওয়া যায়। সন্নিপাত জ্বরে যেখানে রোগীর নাড়ী লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, সেরূপস্থলে দশমূল কিম্বা অষ্টাদশ মূল এবং মস্ত জাতীয় ঔষধ অপেক্ষা কস্তুরী ভৈরব বা সূচিকাভরণ প্রভৃতি ঔষধ অতি শীঘ্র যে স্থায়ী ফল প্রদান করে, তাহা চিকিৎসকমাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কাষ্ঠৌষধ সকল অধিকাংশই শোধক। অনেক রোগই শোধ নাই নহে, এজন্য যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে যেখানে ক্ষয়ানুবন্ধ আছে, সেরূপ স্থলে কাষ্ঠৌষধ অপেক্ষা ধাত্বৌষধ সকল অধিকতর কার্য্যক্ষম হয়। কারণ, রসৌষধ গুলি শমন বলিয়া শোধনাদি না করিয়াই বিষম দোষকে সাম্যা বস্থায় আনয়ন করে এবং রসৌষধ মাত্রেই রসায়ন বলিয়া ক্ষয় নিবারণ করিতে সমর্থ।

বিরুদ্ধোপক্রম স্থলে কাষ্ঠৌষধ অপেক্ষা রসৌষধ প্রয়োগ অধিকতর উপযোগী; যেমন শোথাতীসার-চিকিৎসা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, শোথ কমাইতে গেলে অতীসার বাড়ে এবং অতীসায় কমাইতে গেলে শোথ বাড়িয়া যায়—ইহাই বিরুদ্ধোপক্রম। এরূপ স্থলে কাষ্ঠৌষধ দিয়া চিকিৎসা চলেনা, কিন্তু পর্পটী, লালগুঁড়া, দুগ্ধবটী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে অচিরে সুফল পাওয়া যায়।

গোবিন্দ দাস তাঁহার ভৈষজ্যরত্নাবলীতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

ন দোষানাং ন রোগানাং ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণম্
ন দেশস্য ন কালস্য কার্য্যং রস চিকিৎসিতে॥

এই শ্লোকটী দেখিয়া অনেকে নানা-প্রকার বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার একটী বর্ণও মিথ্যা নহে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে, আয়ুর্ব্বেদ মতাবলম্বী চিকিৎসকগণের ব্যবহৃত মকরধ্বজের সুফলতা প্রত্যক্ষ করিয়া আজ কাল ছোট বড় সকল ডাক্তারই প্র-বিচার শূন্য হইয়া মকরধ্বজ ব্যবহার করিতেছেন, এমন কি, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম আশ্রয়স্থল সুদূর জার্ম্মেনী হইতে এক্ষণে উহা প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বত্র বিক্রীত হইতেছে। "অনুপান বিশেষেণ করোতি বিবিধান্ গুণান্"—যদিও শাস্ত্রে আমরা এই কথা দেখিতে পাই এবং এই বাক্যের অনু-সরণ না করিয়াই যথেচ্ছাক্রমে ইহা প্রয়োগ করি, তথাপি ঔষধের এমনই মাহাত্ম্য যে, সেই যদৃচ্ছ ব্যবহৃত মকরধ্বজের প্রভাবে কিছু না কিছু সুফল পাওয়া যায়ই। এই সকল আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে—

অল্প মাত্রোপযোগিত্বাদরুচেরপ্রসঙ্গতঃ।
ক্ষিপ্রমারোগ্য দায়িত্বাদৌষধে ভ্যোঽধিক রসঃ॥
সাধ্যেষু ভেষজং সর্ব্বমীরিতং তত্ত্ববেদিনা।
অসাধ্যেষ্বপি দাতব্যো রসোঽতঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥

অর্থাৎ রসৌষধ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়, ইহা প্রয়োগে অরুচি হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, এবং ইহা দ্বারা অতিসত্বর আরোগ্য লাভ করা যায়। এই হেতু রসৌষধ সর্ব্ববিধ ঔষধ অপেক্ষা সমধিক গুণকারক বলিয়া জানিবে। পরন্তু পণ্ডিতগণ সাধ্য রোগেই অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ঔষধ বলিয়াছেন, অসাধ্য রোগে কোনও প্রকার ঔষধেরই উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু রসৌষধ কর্ত্তৃক সাধ্য ও অসাধ্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইবার কথা লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার ঔষধ অপেক্ষা রসৌষধেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে! বস্তুতঃ রসৌষধই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য।

ক্রমশঃ

আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা।

[শ্রীভোলাপদ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ]

——:•:——

"ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষানামারোগ্যং মূল মুত্তমং"—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মূলস্বরূপ আরোগ্য। শরীর অথবা মনঃ ব্যাধিযুক্ত হইলে মানব এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে কোন একটীও লাভ করিতে সমর্থ হয় না, ব্যাধিমুক্ত মানব মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় কর্ম্ম-গগনে স্বেচ্ছায় বিচরণ ও শ্রেষ্ঠ স্থান অনায়াসেই লাভ করিতে পারে। সর্ব্বজনবাঞ্ছিত এই আরোগ্য দান যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, সেই কল্যাণকর আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষাদান পুণ্যময় ভারতভূমিতে অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এতাদৃশ সর্ব্বজন কল্যাণকর আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষাপদ্ধতি কি ভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত—মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধির তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাওয়া বামনের চন্দ্রস্পর্শ করিতে উদ্যত হওয়া মাত্র। তথাপি আমি যে আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা বলিয়া কিছু লিখিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা কেবল মাত্র, আমি আয়ুর্ব্বেদের একজন শিক্ষাভিলাষী বলিয়া এবং সুশ্রুতোক্ত এই উপদেশ বাণী আমার তরল মনকে চঞ্চল করিয়াছে, সেই জন্যই সুধীজন সকাশে নিবেদন স্বরূপ আমার মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। সুশ্রুতে উক্ত আছে :—

"যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মস্বপরিনিষ্ঠিতঃ,
স মুহ্যত্যাতুরঃ প্রাপ্য প্রাপ্য ভিরুরিবাহবং ॥
যস্তু কর্ম্মসু নিষ্ণাতো ধার্ষ্ট্যাচ্ছাস্ত্র বহিষ্কৃতঃ
স সৎসু পূজাং নাপ্নোতি বধঞ্চার্হতি রাজতঃ ॥

যে ব্যক্তি কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু কর্ম্মকুশল নহেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ভীরু ব্যক্তির ন্যায় আতুর প্রাপ্ত হইলে মোহ প্রাপ্ত হন। আর যিনি কর্ম্মকুশল কিন্তু ধার্ষ্টতা প্রযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞানে যত্নবান হন নাই—তিনি সজ্জন-সমীপে কখনও সম্মান পান না এবং রাজপুরুষের নিকট দণ্ডনীয় হন। এখন দেখা যাইতেছে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যথার্থরূপে শিক্ষিত হইতে হইলে শাস্ত্র জ্ঞান এবং কর্ম্মাভ্যাস—এই উভয়েরই একান্ত প্রয়োজন, এই উভয় গুণে ভূষিত না হইলে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী কখনও চিকিৎসক পদারূঢ় হইতে পারেন না, অতএব আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা পদ্ধতি শাস্ত্র উপদেশের সহিত সেই উপদেশানুযায়ী কর্ম্মাভ্যাস-সম্পন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিদ্যালয়ে অধ্যাপক আসিলেন, তিনি যথাসম্ভব শাস্ত্রোপদেশ দিলেন, ছাত্রও যথাসম্ভব পরিশ্রম সহকারে শাস্ত্র আয়ত্ত করিল, কিন্তু কর্ম্মাভ্যাসে যত্নবান হইল না। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া এই শিক্ষার্থী যখন ভিষকরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তখন নিশ্চয়ই কোনও দুশ্চিকিৎস্য রোগী উপস্থিত হইলে "স মুহ্যত্যাতুরং প্রাপ্য"—এই ঋষি বাক্যের মর্ম্ম অবগত হইবেন

সংশয় নাই। আবার যিনি কেবল মাত্র কর্ম্মাভ্যাসেই সমধিক যত্ন করিলেন, শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ সকল বুঝিবার আবশ্যক মনে করিলেন না—তিনিও সংশয়যুক্ত ব্যাধি নির্ণয়কালে কোনরূপ কর্ম্মকুশলতা দেখাইতে সমর্থ হইলেন না, অতএব তাঁহার এই কর্ম্মকুশলতা "সৎস্থ পূজাং নাপ্নোতি"। এই শাস্ত্রহীন কর্ম্ম-কুশল যদি সংশয়যুক্ত রোগের চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে অজ্ঞানবশতঃ কোন বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া "বধমার্হতি রাজতঃ" এই বাক্যের সার্থকতা রক্ষা করিয়া বসিবেন।

এই সমস্ত কারণে আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় করিলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল হইবারই সম্ভাবনা। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে শাস্ত্রায়ত্ব ও কর্ম্মাভ্যাস এই উভয় বিষয়েরই শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। পাশ্চাত্যচিকিৎসা বিদ্যালয়ে এই উভয়বিধ শিক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে বলিয়া তথাকার শিক্ষিত চিকিৎসকগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হন সন্দেহ নাই।

আয়ুর্ব্বেদ আটটী অঙ্গে বিভক্ত। বঙ্গ-দেশের আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ভিষক্‌মণ্ডলী এতদিন কেবলমাত্র কায় চিকিৎসারূপ একটী অঙ্গেরই অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছিলেন, অধুনা কয়েকজন কৃতবিদ্য আয়ুর্ব্বেদানুরাগী মহাত্মা সাষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা প্রদান কল্পে কয়েকটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, পূর্ব্বগৌরব অক্ষুন্ন করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। পুনরায় নবভাবে, শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার-ভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ন ও বাজীকরণের সম্যক শিক্ষা লাভ করিয়া যাহাতে ভিষক্ ব্যাধিপীড়িতজনের অশেষরূপে শান্তি দান করিতে পারেন—তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে সেই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক মহর্ষির অমূল্য উপদেশ কর্ম্মাভ্যাস ও শাস্ত্রায়ত্ব—এই দ্বিবিধ বিষয়েই কর্ত্তৃপক্ষ-গণের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শল্যতন্ত্র অধ্যয়নের সমকালীন কর্ম্মাভ্যাস না করিলে, গর্দ্দভের চন্দনভার বহনের ন্যায় কেবল পরিশ্রমই সার হইবে। স মুহুর্ত্যাতুরং প্রাপ্য—এ ঋষিবাণী কখনও নিরর্থক নহে, এযে সকল কথার সার। কল্পনা করুন—একজন শিক্ষার্থী শল্যতন্ত্র অধ্যয়নের সময় বহু যত্নে শরীরের কোন্ স্থানে কোন্ শিরা বিদ্যমান, কোথায় কোন ধমনী অবস্থিতি করিতেছে, কোথায় কোন আশয় অবস্থান করিয়া কোন্ কার্য্য করিতেছে, কেবলমাত্র শাস্ত্রোপদেশে জ্ঞানলাভ করিল, আবার শস্ত্র কর্ম্ম কয়প্রকার, কোন স্থানে কি ভাবে শস্ত্রে প্রয়োগ করিতে হয়—এ সমস্ত ও কেবলমাত্র অধ্যাপকের মুখে শ্রবণ করিয়া ক্ষান্ত হইল, অথচ সমস্ত কর্ম্মের অভ্যাস করিল না, শাস্ত্রজ্ঞান সম্পূর্ণ করিয়া যখন সেই চিকিৎসক কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন, নিশ্চয়ই তখন কোনও রোগীর শস্ত্র কর্ম্ম করিতে উপস্থিত হইলে কর্ম্মে অনভ্যস্ত হেতু তাঁহার পরিশ্রমলব্ধ শাস্ত্রজ্ঞান হারাইবেন। 'ঐ যে রোগীর কাতরব্যঞ্জক বদন শস্ত্রকর্ম্ম ভয়ে আরও কাতর হইয়াছে, কিরূপে এতাদৃশ ব্যথিতের গাত্রে শস্ত্রক্ষেপ করিব, ইত্যাকার মানসিক দৌর্ব্বল্য যে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান

বিলুপ্ত করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, সেই জন্যই ঋষি উপদেশ দিয়াছেন,—

'এতদবশ্যমধ্যেয়মধীত্যচ কর্ম্মাপ্যবশ্যমুপাসিতব্যম্''

শাস্ত্র অবশ্য অধ্যয়ন করিবে, আর অধ্যয়নের সহিত কর্ম্মও অবশ্য অভ্যাস করিবে। কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন, অধ্যয়ন সমকালীন, কর্ম্মাভ্যাসের উপযুক্ত রোগী পাওয়াতো মুখের কথা নয়, অতএব কিরূপে অধ্যয়নের সমকালীন কর্ম্মাভ্যাস হইবে? সে কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা অন্য শাস্ত্রের ন্যায় হইলে চলিবে না। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতে হইলে বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যালয়গুলিকে আদর্শ করিতে হইবে। তথায় যে ভাবে শিক্ষা প্রদান হয়, তদনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করিতে না পারিলে শল্যতন্ত্রমূলক অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা দান কিছুতেই সফল হইবে না। পাশ্চাত্যশারীরতত্ত্ববিদ মনিষীগণ বর্ত্তমানযুগে শারীরতত্ত্বে পারদর্শী, অতএব তাঁহাদের নিকট এইগুলি বিশেষ ভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে, ঋষিও বলিয়াছেন ;—

তদ্বিদ্যেভ্য এব ব্যাখ্যানমনুশ্রোতব্যং।

আর এক কথা, অধ্যয়ন অধ্যাপনার সমকালীন সেই সেই কর্ম্মাভ্যাসের উপযোগী বস্তুর যদি একেবারেই অসম্ভব হয়, তবে তৎসদৃশ কোন দ্রব্যেও কর্ম্মাভ্যাসের উপদেশ দিতে হইবে। ঋষি তজ্জন্যই যোগ্যাসূত্রীয় নামক একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন ;—

এবমাদিষু মেধাবী যোগ্যার্হেষু যথাবিধি,
দ্রব্যেষু যোগ্যাং কুর্ব্বাণো ন প্রমুহ্যতি কর্ম্মসু
তস্মাৎ কৌশলমন্বিচ্ছন্ শস্ত্রক্ষারাগ্নি কর্ম্মসু
যস্য যত্রেহ সাধর্ম্ম্যং তত্র যোগ্যাং সমাচরেৎ॥

কর্ম্ম পথের উপদেশ চাই ই চাই, নচেৎ "সুবহুশ্রুতোঽপ্যকৃতযোগ্যঃ কর্ম্মস্বযোগ্যো ভবতি"। কর্ম্মানুশীলন না করিলে পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারাও কর্ম্মক্ষেত্রে অযোগ্য হয়।

মহর্ষির এই সমস্ত অমৃতময় উপদেশ বাণী স্মরণ করিলে কোন্ ভারতবাসীর আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে না? আমা ঋষির এই সকল উপদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলাম বলিয়াই শল্যতন্ত্রে এতাদৃশ দীনতা প্রাপ্ত হইয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে, দেশবাসীর মতি রতি পুনরায় ঋষিবচনে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের অমৃতময় আদেশ পালনে আবার ভারত সন্তানের আকাঙ্খা জন্মিয়াছে, তাই প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে "সংশোধিত্বামৃতং সম্যক্ কুর্য্যাদর্থবিনিশ্চয়ং, এই সমস্ত আদেশ পালনের অনুষ্ঠানোপক্রম হইয়াছে।

এই শুভলগ্নে, এই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ যাহাতে শাস্ত্রজ্ঞান, ও কর্ম্মাভ্যাস— এই উভয়বিধ শিক্ষা পাইয়া উভয়জ্ঞ হইয়া উঠে, যে বিষয়ে প্রত্যেকে আয়ুর্ব্বেদানুরাগী মহাত্মাগণের লক্ষ্য রাখা প্রধান কর্ত্তব্য। শিক্ষার্থীগণ শাস্ত্র জ্ঞান ও কর্ম্মাভ্যাস—এতদুভয়ের একটিতে জ্ঞানলাভ করিলে চলিবে না, শুধু শাস্ত্রজ্ঞানী অথবা শুধু কর্ম্ম এ উভয়েই কর্ম্মক্ষেত্রে অসমর্থ হয়।

"উভাবেতাবনিপুনাবসমর্থৌ স্বকর্ম্মনি,
অর্দ্ধবেদধরাবেতাবেক পক্ষাবিব দ্বিজৌ॥

মহর্ষির এই কথাটী স্মরণ করিয়া শিক্ষার্থীজনও উভয় বিষয়েই সমধিক পরিশ্রম করিয়া উভয়েই কুশলী হইবেন। এই উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে অর্থসাধনে সমর্থ হইয়া প্রকৃত ভিষক্ পদবাচ্য হইবেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ঋষিও বলিয়াছেন ;—

যস্তূভয়জ্ঞো মতিমান্ স সমর্থো ঽর্থে সাধনে,
আহবে কর্ম্ম নির্ব্বোঢ়ুং দ্বিচক্রঃস্যন্দনোযথা॥

বিসর্প।

(শ্রীশতীশচন্দ্র রায় চট্টোপাধ্যায় বি-এল)

—:০:—

এবার কি প্রকার উৎকট গরম গ্রীষ্মকালে হইয়াছিল তাহা পশ্চিমাঞ্চলবাসীগণ বিশেষ রূপে বুঝিয়াছেন। বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে আমার একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সে সময় এখানে দারুণ গ্রীষ্ম। পুত্রটির জন্মের পর তাহার প্রস্রাব হয় না। প্রথমতঃ ডাক্তারি ঔষধ দ্বিতীয় দিনে দেওয়া গেল, তাহাতে কিছুই হইল না। তাহার পর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করা হইল, কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। তৃতীয় দিনে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া জানা গেল যে, মূত্রদ্বারে ছিদ্র আছে। তৃতীয় দিন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগে কিছু হইল না। চতুর্থ দিনে অতি কষ্টে গাঁদা ফুলের গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়া সোরার সহিত উহা পেষণ করিয়া তৎপেটে প্রলেপ দেওয়ায় কিছুক্ষণ পরেই প্রস্রাব হইয়া গেল।

বালকটি যখন ২৬ দিনের, তখন প্রাতে দেখা গেল যে, জড়সড় হইয়া কোঁথাইতেছে। গায়ে হাত দিয়া দেখা গেল যে, গা গরম। বালকের কোঁথানির কারণ স্থির করিতে না পারিয়া ডাক্তার ডাকিলাম, তিনি আসিয়া থার্ম্মমিটার দিয়া দেখিলেন যে, জ্বর ১০৪° (ডিগ্রী)। শিশুর এত বেশী হঠাৎ জ্বর দেখিয়া তিনি অন্য কারণ স্থির করিতে না পারিয়া উহা ম্যালেরিয়া জ্বর বলিয়া স্থির করিলেন ও সেইমত ডাক্তারি ঔষধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্বর বা শিশুর কষ্ট কমিল না। বৈকালে তাহাকে কোলে লইতে যাওয়ায় পাছায় চাপ পড়ায় খুব কান্দিয়া উঠিল। পাছার উপর হইতে হাত সরাইয়া দেখা গেল যে, পাছায় যে একটু ফুস্কুড়ি হইয়াছিল তাহার চতুঃপার্শ্ব সামান্য ফুলিয়া খুব লাল হইয়াছে। ডাক্তার মহাশয়কে ডাকিয়া দেখান হইল, তখন তিনি উহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, শিশুর ইরিসীপ্লাস অর্থাৎ বিসর্প হইয়াছে। শুনিয়া ও দেখিয়া আমিও বড়ই চিন্তান্বিত হইলাম। তিনি তখন যাহাতে ঐ রক্তবর্ণ স্থান আর না বাড়িতে পারে তজ্জন্য ঐ স্থানে টিংচার ষ্টীল দিলেন ও উহার চতুঃপার্শ্বে টিংচার আইওডিন দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে শিশুর যন্ত্রণা আরও বেশী হইতে লাগিল ও

জ্বর কখনও ১০৩' কখনও ১০৪' হইতে লাগিল ও ঐ ফুলা রক্তবর্ণ স্থান ক্রমশ বিস্তৃত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ চর্ম্মের রক্তবর্ণতা ও স্ফীতি নিম্ন দিকে বিস্তৃত হইয়া পাদদ্বয়ের তলে আসিল। উপরের দিকে বিস্তার সামান্যই হইল। কিন্তু যখন পদতলে রোগের বিস্তার আসিল তাহার পরই উপরের দিকে বিস্তার বেশী হইতে লাগিল। রোগের নিম্নগতি দেখিয়া ডাক্তার বাবু বিপদের কারণ কমই বলিতেছিলেন, কিন্তু উপরের দিকে তাঁহার বিস্তার দেখিয়া তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া ইঞ্জেক্সনের জন্য ব্যস্ত হইলেন। আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম। জ্বর একদিনও ১০২'এর নীচে নামে না। রোগের যাতনা ও তাহার উপর ঐ সকল বাহ্য প্রয়োগের ঔষধে শিশুর এত যাতনা হইতে লাগিল যে, টিংচার ষ্টীলও টিংচার আইওডিন প্রয়োগের সময় মনে হইত যে, শিশুকে বড়ই কষ্ট দেওয়া হইতেছে কিন্তু কি করা যায়, রোগ আরোগ্যের আশায় ঐ ভীষণ যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিতে হইল। রোগ যখন ঊর্দ্ধগামী হইতে লাগিল, তখন পেট ফাঁপাও বাড়িতে লাগিল। ডাক্তারি ঔষধে উপকার না হওয়ায় স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মহোদয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তিনিও যথাসাধ্য যত্ন করিয়া ঔষধ দিতে লাগিলেন, তাহাতে পেট ফাঁপা কমিতে লাগিল ও জ্বর কিছু কমিতে লাগিল, কিন্তু যে সব স্থানে একবার হইয়া সারিয়া আসিয়া ছিল, সেই স্থানের চর্ম্ম একবার উঠিয়া যাওয়া সত্ত্বেও আবার সেই সব স্থানে উহা দেখা দিতে লাগিল ও উপরের দিকেও রোগ বাড়িতে লাগিল। তখন দেখা গেল যে, টিংচার আইডিন ও টিংচার ষ্টিল নূতন চর্ম্মের উপর দিয়া অনর্থক শিশুকে কষ্ট দেওয়া হইতেছে, তখন আমি আয়ুর্ব্বেদীয় শরণাপন্ন হইলাম। স্থানীয় একজন কবিরাজ মহাশয়ের নিকট কোন ঔষধ বা তৈল না থাকায় নিজেই পুস্তক দেখিয়া ঔষধ নির্দ্ধারণে মনোনিবেশ করিলাম। রোগের লক্ষণ মিলাইয়া উহা পিত্তজ বিসর্প স্থির করিয়া তাহার উপযুক্ত ঔষধ প্রস্তুতের উপায় দেখিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে রোগের ঊর্দ্ধগতি দেখিয়া ডাক্তার বাবুকে আবার ডাকিলাম। তিনি বলিলেন যে ইঞ্জেক্সনের ঔষধ শীঘ্র আনান হউক। বাথগেটের ওখানে ঔষধের জন্য পত্র দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে এখানকার আমার বন্ধু উকীল শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন কার্য্যগতিকে কলিকাতা হইতে আসিলেন ও তাঁহাকে ডাকাইয়া দেখাইলাম তিনি বলিলেন, আমাকে তিনদিন সময় দেন, আমি রোগ কমাইয়া দিতেছি ও ৮ দিনের মধ্যে রোগ উপশম করিয়া কলিকাতা যাইব। ইনি হাইকোর্টের সুযোগ্য উকীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন ও বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুত্র বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের সহকারী শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হইল। উহার দ্বিতীয় দিনে রক্তবর্ণ স্থান বাড়িল দেখিয়া ডাক্তার মহাশয় বলিলেন,

দেখুন আজ জ্বর কত বেশী হয়, কিন্তু জিতেন্দ্র বাবু বলিলেন ঔষধে ফল ধরিয়াছে। বাহ্য প্রয়োগের দ্বারা উপরের রোগ গিয়াছিল বটে, কিন্তু উহা ভিতরে ছিল বলিয়া পুনঃ প্রকাশ হইল। তাঁহার কথাই ঠিক হইল। জ্বর আর বাড়িল না, টিংচার ষ্টিল ও আইওডিনের জন্য প্রলেপ বন্ধ করায় শিশু অনেকটা সুস্থ থাকিতে লাগিল। পেট ফাঁপা কখনও কমিতে লাগিল কখনও বাড়িতে লাগিল, কিন্তু জ্বর কম হইতে লাগিল, তখন ১০০° হইতে ১০২° পর্য্যন্ত জ্বর হয়। সেই সময় শিশুর মাথায় কপালে অনেকগুলি উৎকট বিস্ফোটক বাহির হইয়া তাহাকে কষ্ট দিতে লাগিল। আমি ইতিমধ্যে শিশুর মাতাকে "অমৃতাদি কষায়" সেবন করাইতে লাগিলাম। অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় একটা বিশেষ ভুল হইতে লাগিল যে, স্তন্যপায়ীর শিশুর মাতাকে ঔষধ সেবন করাইতে হয় না। কাজেই তাহা হইতেছিল না। আয়ুর্ব্বেদ মতে যে শিশু কেবল স্তন্য পান করে, অন্য খাদ্য খায় না তাহাকে ঔষধ সেবন না করাইয়া তাহার মাতাকেই শিশুর রোগের ঔষধ সেবন করাইতে হয়। এই নিয়মের জন্য আমি শিশুর মাতাকে অমৃতাদি পাচন সেবন করাইতে লাগিলাম। সাত দিন এই প্রকার সেবন করানয় তাহার কপালে যে সকল বিস্ফোটক হইয়া ছিল, তাহা সমস্ত চুঁইয়া গেল, ও বেদনা বা নূতন স্ফোটক কিছুই থাকিল না। তাহাতেই মনে হইতে লাগিল যে, ঐ পাচন ও স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা শিশুর উপকার হইতেছে ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সহায়ক হইতেছে। ইতিমধ্যে আমি করঞ্জ তৈল উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের যুক্তি লইয়া ও তাঁহার সাহায্যে তৈয়ার করিলাম, কিন্তু অত জ্বরের উপর উহা দিতে সাহস পাইলাম না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা সরতোলা দুগ্ধ বা সুইট্ অয়েল বাহ্য প্রয়োগ করিতে বলিতে ছিলেন, কিন্তু জ্বরের উপর ঠাণ্ডা দিলে অন্য রোগের আশঙ্কার ভয়ে উহা দিই নাই। তবে ভাবিলাম যে, যে কি অন্যায় কাজ করা হইয়াছে, যেখানে আয়ুর্ব্বেদমতে মৃণাল প্রয়োগ করিতে হয় হোমিওপ্যাথিক মতে সরতোলা দুগ্ধ বা সুইট্ অয়েলে দিতে হয়, সে খানে ভীষণ জ্বালাকর টিঞ্চার আয়োডিন দিয়া শিশুকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। বিধাতা যেন আয়ুর্ব্বেদের মহিমা প্রচারের জন্যই এই শিশুকে এই ভীষণ রোগ দিয়াছিলেন। অনেক দিন পূর্ব্বে এই সমাচার "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকার প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু নিজের অসুখ ও আলস্যে উহা ঘটিয়া উঠে নাই।

যখন রোগ গণ্ডস্থলে পর্য্যন্ত আসিল তখন ডাক্তার মহাশয় ইঞ্জেকশন নর জন্য জিদাজিদি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বলিলাম যে, দেওঘরে একটী ৭ বৎসরের বালিকাকে ১২টা ইঞ্জেকসান দিয়াও সেখানকার ডাক্তার রোগের বিস্তার ও জ্বর কমাইতে পারেন নাই, তখন ইঞ্জেকসান দিয়া শিশুকে বিপদাপন্ন করিতে পারি না।

যাহা হউক আমিও তখন খুব চিন্তিত হইয়াই যেন ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া একটি গণ্ডে করঞ্জ তৈল লাগাইয়া দিলাম। ঐ তৈল লাগানর ২ ঘণ্টা পরে দেখিলাম ঐ গণ্ডের লাল স্থান কাল হইয়াছে ও ফুলাও কমিয়াছে।

তখন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়কে ডাকাইয়া দেখাইয়া সর্ব্বাঙ্গে ঐ তৈল মাখাইবার অনুমতি চাহিলাম। তিনিও ঐরূপ দেখিয়া আমাকে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বলিয়া ভাবিয়া অনুমতি দিলেন। আমি তখন ধন্বন্তরি ও বিষ্ণু স্মরণ করিয়া ঐ করঞ্জ তৈল সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলাম। ইহার দুই ঘণ্টা পরে শিশুর শরীরের সমস্ত রক্তবর্ণ স্থান কাল হইয়া গেল ও যে জ্বর ২৭ দিন ছাড়ে নাই, তাহা ছাড়িয়া গেল। উভয় চিকিৎসকই তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। শিশুর মাতাকে "অমৃতাদি পাচন" সেবন ও শিশুকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন ও করঞ্জ তৈল মাখান চলিতে লাগিল। ঐ তৈল মাখানর সময় মধ্যে মধ্যে এক একটা লাল দাগ শরীরের কোন কোন স্থানে বাহির হইতে লাগিল ও সেইখানে কাপড় দিয়া ভিজাইয়া তৈল প্রয়োগে ২।১ ঘণ্টায় উহা লোপ পাইতে লাগিল। তৃতীয়দিনে শরীরের নানাস্থানে ১২।১৩টি ছোট আলুর মত গোল গোল স্ফীতি দেখা গেল। উহা যেমন ২।১টি করিয়া পাকিতে লাগিল, তেমনি ডাক্তার মহাশয় কাটিয়া দিতে লাগিলেন, তাহা হইতে তরল পুঁজ খুব বাহির হইতে লাগিল। জ্বর আর একদিনও হইল না ও শিশু ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিল।

অমৃত বৃষ পটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণী
খদিরমসিত বেত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে।
বিবিধ বিষ বিসর্পান কুষ্ঠ বিস্ফোটকণ্ডু,
অপনয়তি মসূরিং শীতপিত্তং জ্বরঞ্চ॥

গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র মুতা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ট, কৃষ্ণবেতের মূল, নিম্বপত্র হরিদ্রা ও দারু হরিদ্রা—সমভাগে ২ তোলা, সর্ব্ব সমেত জল অর্দ্ধসের, পাকশেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই কষায় সেবনে বিবিধ বিষ দোষ, বিসর্প, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, কণ্ডু, মসূরী শীতপিত্ত ও জ্বর আরোগ্য হয়।

করঞ্জ তৈলম্।

করঞ্জ সপ্তচ্ছদ লাঙ্গলীক
স্নুহ্যর্ক দুগ্ধানল ভৃঙ্গরাজৈঃ।
তৈলং নিশামূত্র বিষৈর্বিপক্বং
বিসর্প বিস্ফোট বিচর্চ্চিকাঘ্নম্॥

তৈল ৪ সের। কল্ক:—ডহরকরঞ্জ, ছাতিমছাল, ঈশলাঙ্গলা, সিজ ও আকন্দের আটা, চিতামূল, ভীমরাজ, হরিদ্রা ও মিঠা বিষ মিলিত ১ সের, গোমূত্র ১৬ সের, যথানিয়মে পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে বিসর্প, বিস্ফোট ও বিচর্চ্চিকা রোগ নিবারিত হয়।

এই তৈলে এখনকার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগেনেয়ী পুত্রের সর্ব্বাঙ্গের একজিমা চর্ম্ম রোগ ভাল হইয়াছে।

শিশুর বিসর্প সারিয়া গেল তাহার পর শিশুর সর্ব্বাঙ্গে চুলকানি হইল। রংপুরের একজন কাবরাজ মহাশয়ের পরামর্শমত তাঁহার নিকট হইতে বৃহৎ গুড়ুচ্যাদি তৈল আনাইয়া শিশুর সর্ব্বাঙ্গে মাখানয় দাগগুলি সারিয়া গেল। তাহার পর মাথায় কতকগুলি ক্ষত দেখা দিল ও তাহা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। তাহাতে করঞ্জ তৈলে বিশেষ উপকার হইল না। কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ সুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী এম, বি, দেখিয়া বলিলেন, উহা এক্‌জিমা অফ্ দি স্ক্যাল্প।

তিনি একটী মলমের ঔষধ লিখিয়া দিলেন। মলমের কয়েকটি ঔষধ এখানে পাওয়া গেল না। মনে করিলাম কলিকাতা হইতে ঔষধটি আনাইব। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানীয় কবিরাজ মহাশয় বলিয়া দিলেন যে, বটের শুষ্ক পত্র পোড়াইয়া সেই ছাই নারিকেল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সামান্য কর্পূর দিয়া লাগান। আমি তাহাই লাগাইতে লাগিলাম। তাহাতে ঘা শুকাইতে লাগিল। তাহার পর একজন তামাক পোড়া একটু মিশাইয়া দিতে বলিলেন, তাহাও দিলাম। তাহাতে ক্ষত ১৮ দিনের মধ্যে শুকাইয়া গেল। হোমিওপ্যাথিক মতে চর্ম্মরোগে মলম দিয়া ক্ষত আরোগ্য করিলে অন্যান্য রোগ হইতে পারে বলে, সেইজন্য সেবনের ঔষধ দিয়া উহা আরোগ্য করিতে হয়, অ্যালোপ্যাথিক মতে মলমে ক্ষত সারানর ব্যবস্থা আছে। শিশুর মাথার ক্ষতে নানা প্রকার ডাক্তারি মলম লাগাইয়া কোন ফলই পাই নাই। সামান্য বট পাতার ভস্মে ক্ষত ভাল হইল।

পরম করুণাময় জগদীশ্বর লোকের ব্যাধিও কষ্টে কাতর হইয়া লোকের অজ্ঞাতসারে পৃথিবীতে চর রূপে অবতীর্ণ হইয়া চরক নাম ধারণ করিয়া বহু রোগ আরোগ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আবার কবে এই দারিদ্র্য দুঃখ প্রপীড়িত ব্যাধি বহুল ক্ষীণদেহ ধারী ভারতবাসীগণের অশেষ মঙ্গলের নিদান আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা দেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইবে? লোকের রুচি পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখন আয়ুর্ব্বেদ ভিষকৃগণ সাবধান। আজ আপনারা স্বার্থ ত্যাগ করি। যথানিয়মে পবিত্র ঔষধ প্রস্তুত করিয়া যথাসাধ্য কম মূল্যে চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হউন।

আয়ুর্ব্বেদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান কামনায় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ "আয়ুর্ব্বেদে" পাঠাইলাম।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলাদি পাকের প্রকৃত বিধি।

(কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন কাব্য ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ)

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়!

আপনাদের সম্পাদিত আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকায় প্রকাশিত "আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলপাকবিধি" শীর্ষক প্রবন্ধের মর্ম্ম অবগত হইয়া 'ব্রহ্মডাঙ্গার কুলগাছের' কথা মনে পড়িল। পূর্ব্বে কোনও বড় সাহিত্যিক কোন অর্দ্ধশিক্ষিত লেখকের রচিত ভ্রম পরিপূর্ণ একখানা পুস্তকের সমালোচনা কালে বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গলা ভাষাটা যেন ব্রহ্মডাঙ্গার কুলগাছের মত হইয়াছে, যাহার ইচ্ছা সেই আসিয়া গাছ নাড়া দিতেছে, তাহাকে নিবারণ করিবার বা শাসন করিবার কেহই নাই। আজকাল আয়ুর্ব্বেদের

সংস্কারের কথা শুনিলেই আমাদের সেই মহাকবির ব্রহ্মডাঙ্গার কুলগাছের কথা মনে পড়ে। যাঁহার ইচ্ছা তিনিই আয়ুর্ব্বেদের দুঃখে বিগলিত হৃদয় হইয়া তাহার সংস্কারের জন্য বদ্ধ পরিকর হইতেছেন, আয়ুর্ব্বেদের কতকগুলি চিরন্তন প্রথাকে কুসংস্কার প্রক্ষিপ্ত ভ্রম পরিপূর্ণ বলিয়া কীর্ত্তন পূর্ব্বক সেই সকল দোষ বর্জ্জন করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদ-হিতার্থী-গণকে অনুরোধ করিতেছেন।

আজ আয়ুর্ব্বেদে প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধটী লইয়া কিছু আলোচনা করিব। প্রবন্ধের প্রতি অন্ততঃ আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়গণের কিছু দৃষ্টি পড়া উচিত ছিল, যে হেতু তাঁহারা সকলেই কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ এবং আয়ুর্ব্বেদের সংস্কারের জন্য তাঁহারাই অগ্রসর হইয়াছেন। প্রবন্ধটী পড়িয়া আমিও সকলের মত নীরব থাকিতাম, কিন্তু প্রবন্ধলেখক পরের মনস্তুষ্টির জন্য প্রাচীন বৈদ্যদিগের ঔষধে যথেচ্ছাচারিতা ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বত্র প্রচলিত বৃদ্ধ বৈদ্য পরম্পরায় আগত কতকগুলি ঔষধ পাকের বিধিকেও অবিধি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া সেই মতের সমর্থন জন্য রাজসাহী নিবাসী পূজনীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লিখিত একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এবং সেই পত্রের লিখিত বাক্যই অপ্তোপদেশ স্বরূপ জানিয়া প্রাচীন বৈদ্যগণ যে ভ্রান্ত ছিলেন তাহা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। পত্র পড়িয়া মনে হয় না যে, উহা উক্ত চক্রবর্ত্তী কবিরাজ মহাশয়, লিখিতে পারেন, কারণ উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের সহিত আলাপ না থাকিলেও পরম্পরায় শুনিয়াছি, তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং শিবাবতার গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র বলিয়া তাঁহার উপর অনেকের শ্রদ্ধা আছে। যে বিধি নিয়ম পূজ্য গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—সেই বিধি তিনি অমান্য করিয়াছেন বা শাস্ত্রে দেখিতে পান নাই—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করিব? যাহা হউক উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের পত্রের জন্যই প্রবন্ধের উপর কিছু লিখিতে বাধ্য হইতে হইল।

লেখক ১৩২৯ সালের আশ্বিন মাসে "তৈলাদির পাক বিধি" লইয়া কি লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখি নাই, সকল সময় আয়ুর্ব্বেদ পত্র পড়িবার আমার সৌভাগ্য হয় না, তাহা হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধ ও চক্রবর্ত্তী কবিরাজ মহাশয়ের পত্র হইতে তাহার সার মর্ম্ম বুঝা যায়।

পূজনীয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্রে আছে, "তৈলের মূর্চ্ছা ও গন্ধপাকের কোন বিধি আছে বলিয়া জানি না, অর্থাৎ উহা শাস্ত্রীয় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। প্রাচীন বৈদ্যগণ সম্ভ্রান্ত বড়লোকের মনস্তুষ্টির জন্য গন্ধপাক দিয়া থাকেন, মূর্চ্ছপাক দিলে তৈলের বর্ণ ভাল হয়—ইহাই আমার বিশ্বাস।"

প্রবন্ধ লেখক লিখিয়াছেন, উপরোক্ত পত্র হইতে সংকৃত সমালোচনার কতকগুলি বিষয়ে সমর্থন গৃহীত হইতেছে যথা:—

১ ঘৃত ও তৈলের মূর্চ্ছাবিধি ও তৈলের গন্ধপাক বিধি প্রাচীন নহে। উহা আধুনিক, প্রক্ষিপ্ত ও অশাস্ত্রীয়।

২। মূর্চ্ছা ও গন্ধপাকে, তৈল সুগন্ধ ও অরুণ বর্ণ উৎপাদনে বিলাস পরায়ণ রাজা

মহারাজা এবং সম্ভ্রান্ত বড়লোকের মনস্তুষ্টির জন্য কোন প্রাচীন বৈদ্য কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রচারিত হইয়াছিল, এবং কালক্রমে চিকিৎসক সমাজে উহা এতদূর বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গীভূত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। উপরোক্ত পত্র হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যায় না কি?

৩। "মূর্চ্ছা পাক দিলে তৈলের বর্ণ ভাল হয়, এই উক্তি হইতে পক্ষান্তরে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে না কি যে, স্নেহের আমদোষ কল্পনা অস্বীকার্য্য এবং সর্ব্বত্র মূর্চ্ছা পাকের জন্য অকৃত্রিম বিশুদ্ধ ঘৃত তৈলাদির দোষারোপমাত্র।

৪। উপরোক্ত পত্রে মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা স্নেহের গুণের হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিনা তাহা কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং ঘৃতের মূর্চ্ছা বিধিতে লিখিত "বীর্য্যবৎ সৌখ্যদায়ী" এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দাঁড়ায় নাকি?

৫। তিল তৈলে গন্ধপাকে ক্ষেত্র বিশেষে গুণহানি হইতে পারে—একথাও স্বীকার্য্য।

প্রবন্ধের স্থানান্তরে আছে "আরও আমার পূর্ব্বোক্ত সমালোচনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, মূর্চ্ছাবিধি আধুনিক, এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলাদি প্রাচীন, যেহেতু তিনি চরক সুশ্রুতের কথা দূরে থাকুক কিঞ্চিৎ আধুনিক বাগ্‌ভট্টাচার্য্য, চক্রপাণিদত্ত, শার্ঙ্গধর, শ্রীমিশ্রভাব প্রভৃতি ঋষিকল্প চিকিৎসকগণের প্রস্তুত ঘৃত তৈলাদিতেও মূর্চ্ছাদি পাকবিধি দেখিতে পান নাই।

বঙ্গবাসীর ছাপা যশোদানন্দ সরকারের অনুবাদ সম্বলিত চরকের অনুবাদে কল্পস্থানের ১২ অধ্যায়ে অনুবাদক বলিয়াছেন যে, "তৈলাদিতে মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক চরকমত সিদ্ধ নহে"। ঐ অনুবাদ পড়িয়াই সম্ভবতঃ প্রবন্ধ লেখক মহাশয় তৈলাদির মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক শাস্ত্রীয় নহে বলিয়া প্রমাণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

তৈলাদির মূর্চ্ছাপাক শাস্ত্রীয় কিনা—প্রথমতঃ তাহারই সামান্য অনুসন্ধান করা যাউক। তৈলাদির মূর্চ্ছাপাক বিধি অধুনা প্রচলিত চরক, সুশ্রুত, শার্ঙ্গধর, চক্রদত্ত প্রভৃতি গ্রন্থেও উল্লিখিত নাই. তবে উহা সমস্ত চিকিৎসক সম্প্রদায়ে স্বীকৃত কেন? তবে কি বাস্তবিকই উহা চক্রবর্ত্তী কবিরাজ মহাশয়ের মত সিদ্ধ তৈলের ভাল বর্ণ ও সদ্‌গন্ধের দ্বারা বড়লোকের মনস্তুষ্টি জন্মাইয়া প্রাচীন বৈদ্যগণ টাকাকড়ি কিছু বেশী পাইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলেন? না কিছু মৌলিকতা আছে? প্রাচীন স্পৃহাশূন্য ঋষিকল্প বৈদ্যদিগের উপর এইরূপ দোষারোপ অন্ততঃ ৺ গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র পূজনীয় হারাণ কবিরাজ মহোদয় কিরূপে করিলেন? আমার পিতামহ স্বর্গীয় কবিরাজ ৺গয়ানাথ সেন এবং পিতৃদেব কবিরাজ ৺কেদারনাথ সেনও গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। পিতৃদেবের মুখে এবং যাঁহারা উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যাতায়াত করিতেন, তাহাদের মুখেও ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের তেজস্বীতা ও নিঃস্পৃহতার কথা শুনিয়াছি। বড় লোকের তুষ্টির কথা দূরে থাকুক, চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী না হইলে নবাব মহারাজকেও তিনি উপেক্ষা করিতেন। বড়লোক হইবার জন্য ধনের কামনায়

কখনও নিজ তেজস্বিতা ত্যাগ করেন নাই। আমার পিতামহও বড়লোকের স্বেচ্ছা প্রদত্ত ও অধিক অর্থাদি গ্রহণ করিতেন না; কেবল বৃত্তির জন্য যাহা প্রয়োজন হইত, তাহাই গ্রহণ করিতেন। এখনও বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান জেলার বহু বড় লোকই তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আর সেই পুরাকালের বৃদ্ধবৈদ্যগণ কেবল বড়লোকের মনস্তুষ্টির জন্যই অশাস্ত্রীয় হইলেও বর্ণ ও গন্ধের জন্য তৈলে মূর্চ্ছাদি পাক বিধান করিয়াছিলেন, ইহা একবার চিন্তা করাও কি অপরাধ বলিয়া মনে করা উচিত নহে?

মূর্চ্ছা পাক শাস্ত্রীয় বিধান কিনা, ইহার সিদ্ধান্ত করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে। যথা—অধুনা প্রচলিত সুশ্রুত ও চরক সংহিতায় যাহা আছে, তাহাই ঔষধাদির পাক, প্রয়োগ, শোধন, সংস্কারাদি বিষয়ে যথেষ্ট, না ঐ সংহিতা দ্বয়ের সূক্ষ্মার্থ, সন্দিগ্ধার্থ, লেশোক্ত ও অনুক্ত বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার জন্য বা ব্যবহারের জন্য অন্য পুস্তকের ও পরিভাষায় সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়? যদি কেহ বলেন চরক সুশ্রুতে যে পরিভাষা আছে, তাহাই উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সমুদায় ঔষধাদির পাক, শোধন, সংস্কারাদি বিষয়ে যথেষ্ট, তবে তাঁহাকে চরকের কল্পস্থলের শেষ অধ্যায়ের লিখিত কয়টি পরিভাষা, এবং সুশ্রুতের স্নেহবিধি কল্পনাধ্যায়ে লিখিত কয়টি পরিভাষা দেখিতে অনুরোধ করি। উক্ত পরিভাষা অতি সংক্ষিপ্ত, তাহার দ্বারা চরক সুশ্রুতের সমস্ত তৈল, ঘৃতও পাক করা যায় না, অন্যান্য ঔষধের কথা দূরে থাকুক। এই বিষয়টী একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যথা সুশ্রুতের মহাবলা তৈল, চক্রদত্তের বাতব্যাধি চিকিৎসায় লিখিত আছে।

সুশ্রুতে ঐ তৈল কত পরিমাণে পাক করিবে তাহার উল্লেখ নাই, এই জন্য টীকাকার লিখিতেছেন, তৈলঞ্চমান বিশেষা নির্দ্দেশাৎ প্রস্থপরিমিতমেব গ্রাহ্যং যথা অনির্দ্দিষ্ট প্রমাণানাং তৈলানাং প্রস্থ ইষ্যতে” এই পরিভাষা অবলম্বন করিয়াই টীকাকার উক্তমত প্রকাশ করিলেন কিন্তু ঐরূপ পরিভাষা সংহিতাদ্বয়ে বা চক্রদত্তে নাই।

কৃৎস্নে বৃষে তৎকুসুমৈশ্চ মিদং
সর্পিঃ পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং হিতাশী।
যস্মাৎ মেতৎ প্রবলং চ কাসং
শ্বাসং চ হন্যাদপি পাণ্ডুতাং চ। ইতি সুশ্রুত।

বাসাং সশাখাং সফলাং সমূলাং ইত্যাদি (চরক) বাসাদ্য ঘৃত।

এই ঘৃতে বাসকের সমূল পত্র শাখা অঙ্কুর প্রভৃতির ক্বাথ ও বাসকের পুষ্প কল্ক দ্বারা পাক করিতে হয়। এস্থলে কত পুষ্প কল্কে লইতে হইবে। “কল্কশ্চ স্নেহপাদিকঃ” এই সংহিতা দ্বয়ের মতানুসারে স্নেহের চতুর্থাংশ, না

শনস্য কোবিদারস্য বৃষস্য চ পৃথক্ পৃথক্,
কল্কাঢ্যানাং পুষ্প কল্কং প্রস্থে পল চতুষ্টয়ং॥

এই পরিভাষানুসারে স্নেহের অষ্টমাংশ? উক্ত পরিভাষানুসারে অষ্টমাংশই চক্রদত্ত প্রভৃতি সম্মত ও বৈদ্য সম্প্রদায়ে প্রচলিত। উক্ত পরিভাষাও চরকাদিতে নাই।

চরকের চিকিৎসিত স্থানে ১৯ অধ্যায়ের

পঞ্চমূলাভয়া ব্যোষ বিড়ঙ্গ শঠীভিঘৃতং।
শুক্তেন মাতুলুঙ্গস্য স্বরসেনাদ্রকস্ত চ॥
শুষ্কমূলক কোলাম্বু চুক্রিকা দাড়িমস্য চ।
তক্রমস্ত সুরামন্ত সৌবীরক তুষোদকৈঃ।
কাঞ্জিকেন চ তৎ পক্বং মগ্নিদীপ্তিকরং পরং॥

ইত্যাদি পঞ্চমূল্যাদি ঘৃত ও—

"সিদ্ধমভ্যঞ্জনার্থঞ্চ তৈলমেতৈঃ প্রয়োজয়েৎ" ইতি পঞ্চমূল্যাদি তৈলের উক্তি আছে।

এই তৈল বা ঘৃত, পঞ্চমূল, হরীতকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও শঠী এই সমস্ত দ্রব্যের কল্ক, শুষ্কমূলা কুল, বালা, আমরুল ও দাড়িমের ক্বাথ, শুক্ত. মাতুলুঙ্গের রস, আদার রস, তক্র মস্তু, সুরামণ্ড সৌবীরক, তুষোদক ও কাঁজি এই সমস্ত দ্রব দ্রব্য দিয়া পাক করিতে হইবে। এস্থলে দ্রব দ্রব্য দশ প্রকার, (মতান্তরে তক্রাদি তুষোদক পর্য্যন্ত মিলিত দ্রব ১ ভাগ, সেই মতেও ছয় প্রকার)।

এই ঘৃত ও তৈল চরক সুশ্রুতের কোন্ পরিভাষা মতে পাক করিতে হইবে? "স্নেহাৎ তোয়ং চতুর্গুণং" এই মতে ক্বাথ ও অন্যান্য সমস্ত দ্রব দ্রব্যের মিলিত পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ হইবে? না চক্রদত্ত প্রভৃতি স্বীকৃত সর্ব্ববাদিসম্মত পঞ্চ প্রভৃতি

যত্র স্যু র্দ্রবানি স্নেহ সংবিধৌ।
তত্র স্নেহ সমান্যাহু রর্ব্বাক্ চ স্যাচ্চতুর্গুণং।

এই মতে প্রত্যেক দ্রব পদার্থ স্নেহের সমান লইতে হইবে। স্নেহের সমান হইলে চরক সুশ্রুতোক্ত চতুর্গুণ দ্রব দ্রব্য দ্বারা স্নেহের পাক হইয়া দশ গুণ, বা ষষ্ঠ গুণ দ্বারা পাক হয়।

যেস্থলে তিনের অধিক চার, পাঁচ, ছয় বা দশটী দ্রব দ্রব্যের দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হয়, সেই স্থলেই দ্রব দ্রব্য স্নেহের সমান লইতে হয়। সম্প্রদায় পরম্পরায় বৈদ্য সমাজে ঐ ভাবে পাকই প্রচলিত, ঋষি কথা চক্রদত্ত প্রভৃতি দ্বারাও ইহা স্বীকৃত।

কিন্তু "পঞ্চ প্রভৃতি যত্রস্যু" ইত্যাদি পরিভাষা চরক সুশ্রুতে নাই। আর একটী বিশেষ উদাহরণের দিকে পাঠকগণ লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে প্রচলিত চরক সুশ্রুতের ঔষধের জন্য অপর পুস্তকের আশ্রয় না করিলে চলিতেই পারে না। চরকে হিক্কা শ্বাস চিকিৎসিতাধ্যায়ে মুক্তাদ্য চূর্ণ নামে একটী ঔষধ আছে। তাহাতে মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্য শঙ্খ, স্ফটিক, রসাঞ্জন, কাচ, গন্ধক, তামা, লৌহ, রৌপ্য এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্য আছে। এইরূপ চরক সুশ্রুতের বহু ঔষধে স্বর্ণাদি, হরিতাল, মনঃশিলা, সীসক, রসাঞ্জন তুঁতিয়া প্রভৃতির প্রয়োগ আছে, ঐসকল দ্রব্যের শোধন ও মারণাদি ক্রিয়া করিয়াই ঔষধে প্রয়োগ করিতে হয়, ইহাতে বোধ হয় কাহারও মত দ্বৈধ নাই। যেহেতু শোধানাদি না করিয়া প্রয়োগ করিলে সে ঔষধ প্রাণ রক্ষক না হইয়া বিষবৎ প্রাণনাশক হইবে। বিশেষতঃ ঐ সকলের মিশ্রণই সম্ভব হইবে না। কিন্তু ঐ সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে সকলগুলির শোধন সংস্কার, জারণাদি ক্রিয়া চরক-সুশ্রুতে এমন কি চক্রদত্তেও নাই, অন্যান্য গ্রন্থ হইতে ঐ সকল দ্রব্যের শোধানাদি ক্রিয়া অবগত হইয়া তদনুযায়ী শোধনাদি সংস্কারের পর ঔধধার্থ প্রয়োগ করা হয়। সেই সকল

শোধনাদি ক্রিয়াও বৈদ্য সম্প্রদায় ভেদে নানাপ্রকারে প্রচলিত আছে। অনেক সম্প্রদায় ঐ শোধনাদি ক্রিয়ায় মূল পুস্তক দেখাইতে না পারিলেও প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া বৃদ্ধ পরম্পরা ক্রমে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। সেগুলিও কাহারও মনগড়া নয়, তাহারও মূলে কোন শাস্ত্র ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, কালচক্রে সে সকল শাস্ত্র লুপ্ত হইয়াছে।

এইরূপে চরক, সুশ্রুত, সংগ্রহ শার্ঙ্গধর, চক্রদত্ত, ভাব প্রকাশে স্পষ্টতর না থাকিলেই যে তৈলাদিতে মূর্চ্ছা ও গন্ধ পাক অশাস্ত্রীয় হইয়া যাইবে, বড় লোকের মনস্তুষ্টির জন্য বৃদ্ধ বৈদ্যদের কল্পিত হইবে, ইহার প্রমাণ কি? ইদানীং যে চরক সুশ্রুত প্রচলিত আছে, ইহা ও মূলগ্রন্থ নহে। চরক সংহিতার কিয়দংশ চরকের, কিয়দংশ দৃঢ়বলের সংস্কৃত, সুশ্রুত নাগার্জ্জুনের সংস্কৃত। মূল অগ্নিবেশ সংহিতা বা সুশ্রুত সংহিতা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই বলিয়া কি প্রচলিত চরক সুশ্রুতেও অবিশ্বাস করিব?

এখন বিচারক পাঠকগণ দেখুন অপ্রাচীন চরক সুশ্রুত ও লেখকের মতে কিঞ্চিৎ আধুনিক চক্রদত্তের লিখিত বহু ঔষধের প্রস্তুত নিমিত্ত অন্যান্য শাস্ত্রের পরিভাষা তুতে, হরিতাল বৈদুর্য্যাদি দ্রব্যের শোধন সংস্কারে মারণাদির জন্য অপর গ্রন্থ মানিয়াও চলিতে হয়, সেই সকল মূল শাস্ত্র দৈব দুর্ব্বিপাকে অন্তর্হিত হইয়া গেলেও বৃদ্ধ বৈদ্যগণ সেই শাস্ত্রই শ্রুতি পরম্পরায় স্মরণ রাখিয়া পরে সংগ্রহ রূপে লিখিয়া গিয়াছেন, পরিভাষা সংগ্রহকারদিগের সময়েও দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া সংহিতা দ্বয়ে অনুক্ত নূতন নূতন ভাবে দ্রব্যের শোধনাদি সংস্কার, ও কোন পারিপাটী ক্রমে করিলে ঔষধের বীর্য্য অধিক হইবে এরূপ সংস্কার করিবার বহু বৈদ্য ছিল। চক্রদত্তে বহু ঔষধ ও পাচন আছে যাহা দৃষ্ট ফল সেগুলি প্রচলিত সংহিতাদ্বয়ে না থাকিলে এবং সেই সকল ঔষধের প্রকাশক বা তৎ তৎ মূল, গ্রন্থ না পাইলেই কি মনে করিতে হইবে যে ঐ সমস্ত ও প্রক্ষিপ্ত?

চরক সুশ্রুত নিজের উপরই সমস্ত ভার লইয়া ছিলেন, না

(সুশ্রুত)

একং শাস্ত্র মধীয়ানো ন বিদ্যা চ্ছাস্ত্র নিশ্চয়ং
তস্মাদ বহুশ্রুত শাস্ত্রং বিজানীয়া চিকিৎসকঃ॥

"তথাদনতি সংক্ষেপনে অনতি বিস্তরেণ চোদিষ্টাং
এতাবন্তো হি অল্পবুদ্ধিনাং ব্যবহারায়। বুদ্ধিমতাঞ্চ স্বালক্ষণ্যানুমান যুক্তি কুশলানাং অনুক্তার্থ জ্ঞানায়' (চরক) বলিয়া অন্যান্য শাস্ত্র হইতেও যথাযথ সার সঙ্কিদ্ধার্থ অনুক্তার্থের বিবরণ জানিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ লেখক যেমন পরিভাষাকর ও বৃদ্ধ বৈদ্যগণকে বড়লোকের স্তাবক, অজ্ঞ মনে করিয়াছেন, চরক প্রভৃতি ও তেমনই।

"ঔষধিং নামরূপাভ্যাং জানতে হ্যজপা বনে
অবিধাশ্চৈব গোপাশ্চ যে চান্যে বনবাসিনঃ
বলিয়া ছাগল ভেড়ার রাখালদের নিকট ও চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ সম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য উপদেশ লইতে বলিয়াছেন।

চরকাদিতে না থাকিলে ও যেমন বহু বিষয় আমাদিগকে সম্প্রদায় ক্রমে প্রচলিত ও

প্রসিদ্ধফল বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইতে হইতে হয় সেইরূপ চরক সুশ্রুত—এমনকি চক্রদত্তাদিতে না থাকিলেও তৈলাদি মূর্চ্ছাপাকেও বহু তৈলে গন্ধপাক বা ভাল বর্ণের জন্যই মূর্চ্ছাজির পাক বিধান করেন নাই। (এখানে আরও একটু বলিয়া রাখি, পরিভাষাকার সংগ্রাহক মাত্র, প্রাচীন ঋষি প্রণীত গ্রন্থেরই মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন) যদি কেবল গন্ধ ও বর্ণের জন্যই মূর্চ্ছাদি পাক বিধান করিতেন, তবে তিলতৈল, সরিষারতৈল, এরণ্ডতৈল প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য দিয়া মূর্চ্ছাপাকের ব্যবস্থা করিবেন কেন? ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যাদির দ্বারা মূর্চ্ছাপাকের বিধান করায় ইহাও কি প্রমাণ হয় না যে, প্রত্যেক তৈলেরই বিভিন্ন বিভিন্ন দোষ গুণ আছে, যাহার জন্য একরূপ দ্রব্য দ্বারা সকল তৈলের শোধন সংস্কার এবং আনুষঙ্গিক বর্ণও সম্পন্ন হইতে পারেনা; সেই সকল স্বাভাবিক দোষ দূর করাই মূর্চ্ছাপাকের প্রধান কার্য্য। শোধনের জন্যই সকল ক্রিয়ার প্রথমেই তৈলে মূর্চ্ছাপাক করিতে হয়। কেবল বর্ণ ভাল গন্ধের জন্য ঐ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইলে ক্বাথ ও কল্কাদি পাকক্রিয়ার পরেই উহা করা উচিত ছিল। নতুবা প্রথমে মূর্চ্ছা পাক করিলে এবং অপরাপর দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কাদিয়া পরে তৈলের পাক হইলে তৈল সেই সেই ক্বাথ ও কল্ক দ্রব্যের গন্ধ-বর্ণই পাইবে, ইহা স্বভাব সিদ্ধ। তাহাতে প্রথম পক্ক মূর্চ্ছা দ্রব্যের গন্ধ বর্ণ থাকিতে পারে না। তিল তৈল মূর্চ্ছা বিধির শেষ পাদে।

"দুর্গন্ধং বিনিহত্য তৈলমরুণং সদ্‌গন্ধমাকুর্ব্বতে"—এই অংশটী দেখিয়া মূর্চ্ছাপাকে কেবল তৈলের বর্ণ ভাল হয় বা সদ্‌গন্ধযুক্ত হয়, আর কোনরূপ শোধন সংস্কার ইহার মূলে নাই এরূপ কল্পনা কত দূর সঙ্গত তাহা যাঁহারা প্রাচীন বৈদ্যদিগের মতানুসারে মূর্চ্ছাদি পাক করিয়া তৈল প্রস্তুত করিয়াছেন বা ঐরূপ তৈল ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারাই বিচার করিয়া দেখিবেন। কবিরাজী তৈলের মধ্যে কোনটী দেখিতে মনোহর বা অরুণ সোগন্ধযুক্ত, যাহার জন্য জবাকুসুম তৈলের মত ইহার বি[illegible]য় বা ব[illegible]লোকের মন[illegible]ষ্টি হইতে পারে? শ্রীগোপাল প্রভৃতি তৈলে কস্তূরী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গন্ধ দ্রব্য দিয়াও ইহার মনোহর গন্ধ বাহির করিতে পারা যায় নাই। কলিকাতায় ব্যবসা

ক্রমশঃ

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও পাচন চিকিৎসা।

(কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী বিদ্যারত্ন।)

অনেক সময় দেখা যায় যে, নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগে কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু সামান্য একটী মুষ্টিযোগ রোগের সমতা হইয়া থাকে। এরূপ সামান্য সামান্য

মুষ্টিযোগ জানা থাকিলে কার্য্যকালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু তা' বলিয়া যা'র তা'র নিকট শ্রুত এবং বিশেষরূপে অপরীক্ষিত ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নহে। রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ যে মুষ্টিযোগে যাহার রোগ আরোগ্য হইয়াছে—তাহার কি প্রকৃতির রোগ হইয়াছিল, তাহা বিশেষ জানিয়া তবে নিজে বা অপরের শরীরে সেই ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। নতুবা অনেক স্থলে অনিষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে সাধারণে—বিশেষতঃ প্রাচীনা স্ত্রীলোকগণ শত শত স্থলে পরীক্ষিত নানাবিধ মুষ্টিযোগ জানিতেন এবং ছেলে মেয়েদের সামান্য সামান্য রোগে নিজেরাই চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নাড়া জ্ঞান এত উৎকৃষ্ট ছিল যে, অধুনা অনেক শিক্ষিতাভিমানী কবিরাজদের তাহা নাই। সেরূপ স্ত্রীলোক বা পুরুষ আজকাল যে একবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা নহে, কিন্তু যেরূপ সময়ের স্রোত পড়িয়াছে, তাহাতে কালে এরূপ দুই একজনও পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। যাহাতে আবার প্রসূতিগণ আপন ছেলে মেয়েদিগকে সামান্য সামান্য রোগে মুষ্টিযোগ ও পাচনাদি দ্বারা সুস্থ করিতে পারেন, সদা অসচ্ছল ও দুঃখময় সংসারে সকলেই যাহাতে কথঞ্চিৎ শান্তি সুখ আনয়ন করিতে পারেন—তজ্জন্য আমাদের এই উদ্যোগ, এখানকার শিক্ষাকর্ষিত হৃদয়ে অবশ্যই ইহা স্থান পাইবে আশা করি।

জ্বর,—(১) মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, প্রবল শিরঃপীড়া ও শিরশ্চালন থাকিলে—সোরা ও নিশাদল জলে ভিজাইয়া সেই জলসিক্ত বস্ত্র দ্বারা রগে ও ব্রহ্ম তালুতে পটী দিবে, শিরঃপীড়া প্রভৃতির শান্তি হইলে আর জল দিবার প্রয়োজন নাই। (২) কনক চাঁপার ফুল কাঁজির সহিত বাটিয়া কপালের উভয় পার্শ্বে প্রলেপ প্রদান করিলে জ্বরকালীন মস্তক বেদনা প্রশমিত হয়, (৩) কৃষ্ণ জীরা বাটিয়া কপালের উভয় পার্শ্বে প্রলেপ দিলে ক্ষণকাল মধ্যে মস্তক বেদনা নিবৃত্তি হয়। (৪) নারিকেল পুষ্প, দারু চিনি ও লবঙ্গ এই কয়টী দ্রব্য সমভাগে লইয়া জল দ্বারা বাটিয়া কপালের দুই ধারে প্রলেপ প্রদান করিলে মস্তক বেদনা প্রশমিত হয়, (৪) সূর্য্যাবর্ত্ত বৃক্ষের পক্ক বীজ বাটিয়া কপালের উভয় পার্শ্বে প্রলেপ প্রদান করিলে মস্তক বেদনা নিবারিত হয়, (৬) যন্ত্রণাদায়ক মাথার কামড়ানি উপস্থিত হইলে কুড় কাষ্ঠ জলের সহিত উত্তমরূপে চন্দনের ন্যায় ঘসিয়া কপাল জুড়িয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে।

জ্বরে পিপাসাদমনোপায়—(১) আম ও জামের কচি পাতা, বটের শূঁয়া ও বেণার মূল—প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা ওজনে লইয়া একত্র ছেঁচিয়া আধ সের গরম জলে ৩ ঘণ্টা ভিজাইয়া সেই জল অল্প চিনি সংযুক্ত করিয়া মধ্যে মধ্যে পান করিলে পিপাসা নিবৃত্তি এবং জ্বরাবস্থার বমন, অতিসার ও মূর্চ্ছায় বিশেষ উপকার দর্শে। (২) মরিচ, যষ্টিমধু পেয়ারার কচি পাতা ও গুঁদির ফুল প্রত্যেক আধ তোলা, অল্প ছেঁচিয়া এক পোয়া জলে ৩।৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া সেই জল মধ্যে মধ্যে পান করিতে দিলে পিপাসা নিবৃত্তি হয় এবং বমনে ও বিশেষ উপকার দর্শে, (৩) এক কাচ্চা

পরিমাণ ধনিয়া ও মৌরী অর্দ্ধ কুট্টিত করিয়া এক পোয়া গরম জলে ২ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে ছাঁকিয়া ঐ জল পিপাসার সময় মধ্যে মধ্যে পান করিতে দিলে পিপাসার শান্তি হয়। (৪) অর্দ্ধ সের পরিমিত শীতল জলে ১ বা ২ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে পান করিতে দিলে পিপাসার শান্তি হয়। (৫) যষ্টিমধু ১ তোলা, মৌরী এক তোলা পাক জন্য জল /৪ সের শেষ /২ সের, থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া মধ্যে মধ্যে পান করাইলে পিপাসার শান্তি, উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রবেরও নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। (৬) কুড়, বটাঙ্কুর ও খৈ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলেও পিপাসার শান্তি হয়।

জ্বরে বমন ও রক্ত বমন প্রশমনে—(১) ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম নারী—দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে বমি অচিরে বিনষ্ট হইয়া থাকে। (২) দুই আনা পরিমাণ শশা বিচির শাঁস—নারী দুগ্ধের দ্বারা বাটিয়া আলতা গোলা জলের সহিত পান করাইলে বমি প্রশমিত হয়। (৩) খৈ ৫ তোলা, মিছরী ২॥০ তোলা— এক পোয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে, মিছরী গলিয়া গেলে ছাঁকিয়া তাহাতে লেবুর রস এবং কিঞ্চিৎ গোলাপ জল দিয়া পান করিতে দিলে উপস্থিত বমন প্রশমিত হয়। (৪) সংবৎসরাতীত তেঁতুল ২ তোলা লইয়া একটী গোলক বাঁধিবে, কোন প্রস্তর বা কাঁচ পাত্রে সেই গোলক রাখিয়া তাহাতে এক পোয়া জল দিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে, যখন দেখিবে যে জল রঞ্জিত হইয়াছে, তখন উক্ত গোলক উঠাইয়া সেই জল অম্ল মধুর হয়—এরূপ উপযোগী ইক্ষু চিনি দিয়া পান করিতে দিবে, ইহাতে প্রায় সর্ব্বপ্রকার বমন নিবৃত্তি হয়। (৫) মকর-ধ্বজ অর্দ্ধ রতি, শশাবীজের শাঁস দুই আনা, কর্পূর অর্দ্ধ রতি, আলতা গোলা শুষ্কদুগ্ধ ৪ তোলা, একত্র পান করিলে পিত্ত, বাতপিত্ত এবং সন্নিপাত জ্বরে লাক্ষনিক ও ঔপদ্রবিক বমন প্রশমিত হয়। (৬) যষ্টিমধু ১ তোলা, রক্তচন্দন ১ তোলা—উভয় দ্রব্য উত্তমরূপে পেষন করিয়া বার তোলা তণ্ডুলোদকে ভিজাইয়া রাখিবে, কিছুক্ষণ পরে ছাঁকিয়া প্রয়োগ করিলে নানাপ্রকার বমন প্রশমিত হয়। (৭) বন্ধা দুগ্ধের সহিত রক্তচন্দন ঘসিয়া সেই ঘসা ২ তোলা, যষ্টিমধু চূর্ণ দুই আনা, একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ৮ তোলা বন্ধা দুগ্ধে ককিয়া পান করিলে রক্ত বমন নিবারিত হয়। (৮) পাকা যজ্ঞ ডুম্বুর ৫।৬টা, ছোট আলতার পাত ৫।৬ খান, বন্ধা দুগ্ধ ৮ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া পান করিলে রক্ত বমন নিবারিত হয়। (৯) অশ্বথের শুষ্ক ছাল আগুনে পোড়াইয়া পরিষ্কার জলে ফেলাইয়া ঢাকিয়া রাখিবে, শীতল হইলে ছাঁকিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বমন প্রশমিত হয় এবং হিক্কাও নিবারিত হইয়া থাকে। (১০) অর্দ্ধ রতি লৌহ ভস্ম অর্দ্ধ ছটাক থোড়ের রসে গুলিয়া পান করিতে দিলে বমন নিবারিত হয়। (১১) খৈ ৫ তোলা, কাঁচা নিমের পাতা এক কাঁচ্চা, এক পোয়া জলের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় ৩।৪ বার পান করিলে বমি নিবারণ হয়। (১২) বড় এলাইচ—গোবরের মধ্যে পুরিয়া দগ্ধ করিবে, পরে তাহার চূর্ণ মধুসহ

সেবন করিলে বমন নিবারিত হয়। (১১) আতপ চাউল এক মুঠা ধৌত করা মুথা ১০।১৫টা, শশা বীজের শাস ১০।১৫টা, জায় ফল সিকি ভাগ (সিকি খানা) এক পোয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া রাখিয়া দিবে, ইহাতে বমি নিবারণ না হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে আধ ছটাক পরিমাণে ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

জ্বর গাত্র দাহ নিবারণোপায়,—(১) পলাশ বৃক্ষের কোমল পত্র কাঁজি দ্বারা বাটিয়া দাহ পীড়িত ব্যক্তির মস্তকে (মস্তকের চুল ফেলিয়া) প্রলেপ দিলে গাত্র জ্বালা প্রশমিত হয়। (২) ভূমিকুষ্মাণ্ড, সরস দাড়িম্বের বীজ, লোধ, কয়েদ বেলের শাঁস এবং ছোলঙ্গ লেবুর কেশর—এই সমস্ত দ্রব্য সম পরিমাণে লইয়া দাড়িম্বের রসের সহিত অথবা জলের সহিত বাটিয়া (মস্তকের চুল ফেলিয়া) মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে গাত্র দাহ প্রশমিত হয়। (৩) জ্বরে অতিরিক্ত গাত্র দাহ থাকিলে বেশী পরিমাণে কাঁচা নিমপাতা বিছানায় পাতিয়া তাহার উপর রোগীকে শয়ন করাইবে। ইহাতে শীঘ্রই গাত্র জ্বালা প্রশমিত হয়। (৪) পিত্তজ্বরে অত্যন্ত দাহ থাকিলে কাঁজি দ্বারা বস্ত্র আর্দ্র করিয়া শরীর অবগুণ্ঠন করিলে দাহ নিবৃত্তি হয় (৫) কুলের কচিপাতা প্রথমতঃ অল্প কাঁজির সহিত বাটিয়া অধিক পরিমাণে কাঁজির সহিত মন্থন করিতে থাকিবে, মন্থন করিলে যে ফেনা উঠিবে সেই ফেনা গাত্রে মালিস করিলে গাত্র জ্বালার শান্তি হয়। উপরোক্ত নিয়মানুসারে নিম পত্রের ফেনা গাত্রে মালিস করিলে গাত্র দাহ প্রশমিত হয়। (৬) জ্বরে অত্যন্ত দাহ ও বহির্দাহ থাকিলে ধনে ২ তোলা কুটিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া প্রস্তর পাত্রে রাখিয়া দিবে, পরদিন ছাঁকিয়া অর্দ্ধতোলা ইক্ষু চিনি দিয়া পান করিতে দিবে। সর্ব্বপ্রকার দাহ প্রশমনার্থ ইহা মহৌষধের মধ্যে পরিগণিত। (৭) তেলাকুচার পাতার রসের সঙ্গে অল্প ভাজা যোয়ানের গুঁড়া বেশ করিয়া মিশাইয়া হাতের ও পায়ের তলে মালিস করিলে হাত ও পা জ্বালা নিবারণ হয়। (৮) দাহ যুক্ত জ্বরিত ব্যক্তিকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া তাহার নাভির উপর তামার, কাঁসার, বা পিতলের একটা বড় বাটী স্থাপন করিয়া পুনঃরপি ধারা দিবে। পাত্রটী পূর্ণ হইলে জল পরিত্যাগ করিয়া পুনরপি ধারা দিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে দাহ নিবারণ হয়। ইহার দ্বারা হিক্কা প্রশমিত হইতে পারে।

জ্বরের মুখে দুর্গন্ধ নিবারণোপায়।—(১) আদার রস দ্বারা কয়েক বার কুলকুচা করিলে মুখের দুর্গন্ধ নিবারিত হয় ও মুখ পরিষ্কার হয়। (২) শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই তিনটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া বাটিয়া অথবা চূর্ণ করিয়া মুখে ধারণ ও জল সহযোগে কুলকুচা করিলে মুখের দুর্গন্ধ ও শ্লেষ্ম লিপ্ততা দূরীভূত হইয়া থাকে।

জ্বরে হিক্কানিবারণোপায়।—(১) মকর ধ্বজ অর্দ্ধরতি, মৃগনাভি ১ রতি, কর্পূর ১ রতি সহ মিশ্রিত করিয়া লাটয়ের আঁকড়ার রস দিয়া সেবন করাইলে হিক্কা নিবারণ হয়। একবার প্রয়োগে ফল না দর্শিলে ২।৩ বার প্রয়োগ করিবে। এই যোগ বিকারঘ্নও বটে। (২) মরিচের ধূম অথবা তাদৃশ

কোন তীক্ষ্ণ ধুম নাসিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ হিক্কা নিবৃত্তি পায়। (৩) পেটে ভাতের পুল্‌টিস্ দিলেও হিক্কাশান্তি হয়। (৪) ডুম্বুরেকে চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে, সেই জল আধঘণ্টা অন্তর আধছটাক পরিমাণে ৩।৪ বার সেবন করাইলে নিশ্চয়ই হিক্কার শান্তি হইয়া থাকে। (৫) হিং ও মাসকলাই নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধুম পান করিলে হিক্কা নিবারণ হয়। (৬) চিনি ও মরিচ মধুর সহিত পুনঃ পুনঃ লেহন করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

জ্বরে শ্বাস নিবারণোপায়,—(১) বহেড়ার বীজের শাঁস ৫ রতি, পিপুল চূর্ণ ২ রতি মধু যোগে সেবন করাইলে শ্বাসের শান্তি হইয়া থাকে, (২) ময়ুর পুচ্ছ ভস্ম ৩ রতি, পিঁপুল চূর্ণ ৩ রতি একত্র মধুর সহিত লেহন করাইলে শ্বাস প্রশমিত হয়, (৩) যোয়ান চূর্ণ, পিঁপুল চূর্ণ, সৈন্ধব লবণ চূর্ণ এবং আকরকরা বচ চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে, পরে ধুতুরা ফলের মুখ কাটিয়া বীজ ফেলিয়া দিবে এবং তাহার মধ্যে ঐ মিশ্রিত চূর্ণ আল্‌গা ভাবে পুরিয়া মুখটির দ্বারা বন্ধ করিয়া সুতা দিয়া বাঁধিবে, তৎপরে কাদা দিয়া লেপিয়া ঘুঁটিয়ার আগুনে পোড়াইবে, লেপ শুষ্ক হইলেই তুলিয়া লইবে, শীতল হইলে খুলিলে দেখা যাইবে ধুতুরার রসে চূর্ণগুলি কাদার ন্যায় হইয়াছে, তখন বাহির করিয়া মর্দ্দনের পর ২।৩ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। দিবসে ৩।৪ বটী গরম জলের সঙ্গে সেবন করিলে শ্বাস প্রশমিত হয়। ইহাতে সঞ্চিত শ্লেষ্মা সহজে নিঃসৃত হয় তজ্জন্য শ্বাস কাস রোগেও উপকার হয়। (৩) কাবাব চিনি চূর্ণ ২ রতি, কর্পূর আধরতি একত্র মধুর সহিত লেহন করিলে কাস নষ্ট হয়। (৪) পানের রস ২ তোলা, পিঁপুল চূর্ণ ২ রতি ও মধু এক সিকি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে কাস নিবারিত হইয়া থাকে, (৫) পান, কালতুলসীর পাতা ও আদা একত্র ছেঁচিয়া রস গ্রহণ করিবে, সেই রস ২ তোলা, লবঙ্গ চূর্ণ ২ রতি এবং কর্পূর আধরতি একত্র মিশাইয়া পান করাইলে কাস প্রশমিত হইয়া থাকে। (৬) ব্যাকুড় গাছের সরু শিকড় বা বড় বড় শিকড়ের ছাল, গাছের পাতা, ছাল, ফল এবং ফুল এক সঙ্গে কিঞ্চিৎ জল দিয়া উত্তমরূপে ছেঁচিবে, সেই ছেঁচা দ্রব্য কলা পাতায় বাঁধিয়া আগুনে তপ্তকরতঃ ২ তোলা রস গ্রহণ করিবে, উহার আধতোলা মধু মিশাইয়া সেবন করাইলে কাসে বিশেষ উপকার হয়।

জ্বরে হৃদ্‌ব্যথা প্রশমনোপায়।—(১) বুড়ি পানের রসে লবণ সংযোগ করিয়া মর্দ্দন করিলে হৃদ্‌ব্যথার শান্তি হয়। (২) রস সিন্দুর উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃতকাঞ্চনের রসে মর্দ্দন করতঃ পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে উক্ত প্রকারের ব্যথা নিবৃত্তি হয়, শুষ্যমান প্রলেপ উষ্ণ উষ্ণ জলে ধৌত করিয়া পুনর্ব্বার প্রলেপ দিবে। (৩) কর্পূর চূর্ণ দশ আনা, সর্ষপ তৈল অর্দ্ধ ছটাক এবং সর্ষপ চূর্ণ পাঁচ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া বেদনা স্থানে মর্দ্দন করিলে বিশেষ ফল দর্শে। (৪) পুরাতন ঘৃত ও আদার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূর চূর্ণ সহ ফেনাইয়া বেদনা স্থানে মর্দ্দন

কর**: তদুপরি আকন্দের পাতা তপ্ত করিয়া স্বেদ দিলে হৃদ্‌ব্যথা শান্তি হয়। (২) পালিধা মাদারের বীজ চূর্ণ, সর্ষপ তৈল, আদার রস ও কর্পূর চূর্ণ একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রতপ্ত করতঃ বেদনা স্থানে মর্দ্দন করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

ক্রমশঃ

ফাগুনে হাওয়া।

(শ্রীক্ষীরোদ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ,)

—:০:—

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ঋতুপরিবর্ত্তনের সময় প্রায়ই লোকের অসুখ হয়। শীতের আরম্ভ ও অবসান এই দুইটি সন্ধিস্থল প্রীতিকর ও আরামদায়ক হইলেও কতকগুলি রোগের আকর। ছয়মাস লোকে খোলা গায়ে হাওয়া লাগাইয়া থাকিল; পরিধানের পাতলা কাপড় খানা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া ফেলিলে বাঁচে, গরমে গুমটে এতই আশান্তি বোধ হয়। তারপর যেই কার্ত্তিক মাস আসিল, অমনি জামা মোজা, লেপ, কাঁথার যোগাড় কর। আশ্বিন মাস হইতেই একটু একটু হিম পড়িতে থাকে। তখনও কনকনে শীত না পড়ায় লোকে অসাবধানতা বশতঃ নিয়মিতরূপে গরম কাপড় চোপড় ব্যবহার করে না এবং হিম লাগায়। গত বৎসরের শীতের অভিজ্ঞতা জ্বর জ্বালা ভুলাইয়া দেয়; কাজেই তখনও শরীর শীতসহ না হওয়ায় সহসা একটু অনিয়মেই ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। ভাদ্র আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণের শেষ পর্য্যন্ত অনেক রুগ্ন বালক-বৃদ্ধ-যুবক-যুবতী ভবলীলা সাঙ্গ করে।

বিশেষতঃ শিশু ও দীনদুঃখী মরে শীত কালে। অভাব বশতঃ ভাল খাবার খাইতে পায় না এবং গরম কাপড় চোপড় না থাকায় হিম লাগায়। কাজেই ফুস্‌ফুস্ ঘটিত ব্যারাম যেই ধরে সেই আর রক্ষা নাই। এইরূপ আবার ফাল্গুনের আরম্ভেই লোক মরে বসন্ত, ইন-ফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা প্রভৃতি ব্যারামে। দুপুর বেলা একটু তাপ ফুটিলেই লোক মনে করে, শীত গিয়াছে, আর অমনি জামা কাপড় খুলিয়া সকাল সন্ধ্যায় খোলাগায়ে ঠাণ্ডালাগায়, গলার বীচি ফুলিয়া উঠে এবং সর্দ্দি জ্বর, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। ছোট শিশুদের হামজ্বর, পানিবসন্ত, প্রভৃতি ব্যারাম সচরাচর এই সময়েই হইয়া থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই যখন যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করেন না, তখন পরনির্ভর অনভিজ্ঞ শিশু যে অসাবধান হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

নানা দোষ থাকিলেও ফাল্গুনের গুণও আছে অনেক। নির্দ্দোষ কেহ জগতে আছে কি? এমন যে চাঁদ তাহাতেও কলঙ্ক! তবে আর ফাল্গুনের সামান্য দোষ ধরিয়া লাভ কি?

ভোগ বিলাসী দ্বিতলবাসী সৌখিন বিরহী-বিরহীণীরা ফাল্গুনের উপর নাকি বড়ই চটা।

তাঁহারা মনের দুখে বলেন, "ফাল্গুনে আগুন লাগুক, কোকিলের কণ্ঠরোধ হোক, মলয় হাওয়ার কাণে কথা কহা ঘুচে যাক।" বিরহী বা প্রোষিত ভর্ত্তৃকা যাহাই বলুন, ফাল্গুনের কাছে পল্লীবাসী চির ঋণী। এ ধার পরিশোধ করিতে আমরা কখনই পারিব না ফাল্গুন আছে তাই বাঙ্গলার পল্লীতে এখনও মানুষ বাঁচিয়া আছে; নতুবা কোন্ কালে পল্লী জনহীন শ্মশানে পরিণত হইত!

ফাল্গুনের অভাবে যদি পল্লীতে আগুন লাগিত, তাহা হইলে পল্লীর ভাগ্যে যাহা ঘটিত তাহা ত সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হায়! সহরের দশা কি হইত? এখনও এইসব মরা পল্লীর হাড় চামড়া হইতে রস বাহির হইয়া মোটা মোটা গোদা গোদা সহরগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এইসব ম্রিয়মাণ পল্লী হইতেই যাবতীয় খাদ্য সামগ্রী উৎপন্ন হইয়া সহরের বুক ভরাইতেছে। মরা হাতী লাখ টাকা। এখনও এই মরা গ্রাম গুলিই জীবন্ত সহরের জীবন ধারণের একমাত্র উপায়। যদি সত্যই ভগবানের অভিপ্রায়ে কালক্রমে গ্রামগুলি মরিয়া যায়, তাহা হইলে সুশিক্ষিত নগর বাসী ভদ্রমহোদয়গণ কি কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সহর বা সহরতলীর নিকটবর্ত্তী অন্তরীক্ষে লাঙ্গল দিয়া ফসল উৎপাদন পূর্ব্বক এই নিদারুণ অন্নসমস্যার সমাধান করিবেন? জানিনা তাঁহাদিগের অসাধারণ উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে কি উপায় উদ্ভাবিত হইবে। আমাদের কিন্তু সহজ সাধারণ স্বল্প বুদ্ধিতে এইমাত্র মনে হয়, অসভ্য চাষাই সহরের সৌন্দর্য্যের বনিয়াদ। এই পল্লীবাসী কৃষক বন্ধুর মৃত্যুতে সমগ্র জাতি বিষম ক্ষতি গ্রস্ত হইবে। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, এখনও এই সব মরা পল্লীর অনুগ্রহেই চারটী ডাল ভাত পাইতেছি; পল্লী মরিলে, আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষিয়া ক্ষুন্নিবারণ করা ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকিবে না।

ফাগুনে হাওয়ায় তরুলতা, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ-জীবজন্তু সকলেই নব জীবন লাভ করিয়া পুলকিত। নূতন রস সঞ্চারে সকল পদার্থই আজ হর্ষোৎফুল্ল। পাদপ নিচয় দারুণ শীতের সহিত লড়িয়া যেন পরাভব স্বীকারে জড় সড়ও নিস্তেজ হইয়াছিল। বসন্ত সমাগমে একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। নবকিশলয় গুলি মনের আনন্দে হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া মলয়সমীরের সহিত খেলা করিতেছে। তাহাদের এ খেলা রাত্রিতে আরও মধুর। চাঁদের জ্যোৎস্না মাখিয়া যখন তাহারা দখিনে হাওয়ার সহিত গলাগলি করে, তখন দেখিলে প্রাণ এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হয়। এ আনন্দের ভাগ হতভাগ্য পল্লীও একটু পাইয়াছে, গায়ের জামা খুলিয়া খোলস ছাড়িয়া হাওয়া খাইয়া তাহার জ্বালার প্রাণ জুড়াইল, মৃতদেহে যেমন জীবন সঞ্চার হইল।

পল্লী হইতে ছানা বিক্রেতা সহরে ছানা বেচিয়া গৃহে ফিরিবার সময় আর জারমণীন বা পাইরেক্স লইয়া যায় না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে মশাই, এ বছরের মত বেঁচে গেলাম। ফাগুনে হাওয়ায় ছেলে মেয়ের ফুলো মাঘ লেগেছে। সহরে যাহারা তরকারী বেচিতে আসে, তাহারা বাড়ী যাইবার সময় তেল, নুন, চিনি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহিত টনিক, ডিগুপ্ত বা গেলের পাচন লয় না। তাহারা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া

বলে,—ফাগুনে হাওয়ায় নুতন রক্ত হয়েছে; আর ওষুধ পথ্য খরচে এখন কিছুদিনের জন্য হয়রাণ হ'তে হবে না। এবার জ্বরে বড় দুঃখ পেয়েছি, সে জ্বালা ভুলিবার নয়। উঃ! কত দিনে আমরা এই ম্যালেরিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব!!

যিনি যাহাই বলুন, ফাগুনের গুণের অন্ত নাই। ব্রহ্মার ন্যায় পঞ্চমুখ পাইলেও ফাগুনের প্রশংসা কথঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

অনেকে বলেন, ফাগুন মাসটা বড় খারাপ, কেননা ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় হাম, বসন্ত, চোখউঠা, সর্দ্দিজ্বর, কাশি, কলেরা, প্রভৃতি জ্বর জ্বালার প্রকোপ হয়। এ সব না হয় তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলাম, কিন্তু ফৌজদারীতে যে নাকাল ও হয়রাণি, দেওয়ানীতে তদপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। দেওয়ানী ম্যালেরিয়ার বাড়া দুঃখ জগতে আর আছে কিনা জানি না। গুর্‌গুর্ করে পাঁজর দিয়ে শীতটা যখন উঠে আর অমনি তিন খানা লেপ চাপিয়ে ধ'রে থাকলেও শীত ও কম্প থামে না। তারপর কি ভীষণ দাহ, গাত্র জ্বালা, শিরঃপীড়া ছটফটানি প্রভৃতি অসহ্য যন্ত্রণা যখন হয়, তখন ভুক্তভোগী মাত্রেই প্রাণে উপলব্ধি করেন, দেওয়ানী ম্যালেরিয়া কি বীজ। রক্ত শুষিয়া রাক্ষসী ক্রমে রোগীকে ক্ষীণ ও নিস্তেজ করিয়া ফেলে; তাই সহজেই অন্য ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করিবার সুবিধা পায়।

ফল কথা ফাগুন আছে বলিয়াই এখনও পল্লী নির্জ্জন হয় নাই। যাঁহারা সহরে প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করেন, মোটর গাড়ীতে যাতায়াত করেন, মাটিতে বড় বেশী পা দেন না, তাঁহারা ম্রিয়মাণ বঙ্গ পল্লীর দুঃখ বুঝিবেন না যার জ্বালা সেই জানে। কৃষিজীবী পল্লীবাসী মাটি লইয়াই জীবন সংগ্রামে দাঁড়াইয়া আছে। বন-জঙ্গল-পচাজল-কাদা-মাটিতেই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে; কিন্তু মাটি ছাড়িলে সে খাইবে কি? শুধু তাহারই বা কেন, যে মাটি হইতে অন্নের উদ্ভব, তাহা যে দুনিয়ার জীবন! ফাগুনে খাল বিল গর্ত্ত ডোবা শুষ্ক প্রায়; চতুর্দ্দিক খটখটে খোলা ময়দান। পাতা পচা বন্ধ হইয়াছে। ফাঁকা মাঠের মিঠা হাওয়ায় হাড়ের জ্বর ছাড়িয়াছে।

অনেকে ভাদ্র হইতেই এবার পড়িয়াছিল। কত জারমলীন জ্বরের যম, কত সর্ব্বজ্বর গজসিংহ, কতসপ্ততিক্ত ব্যাধিশার্দ্দূল, কত গুপ্ত, সেন, পাল বোতল বোতল খাইল, তথাপি জ্বর ছাড়ে নাই। কেমন একটু মুখতিক্ত, মাথাভার, কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, কাজে আলস্য ও ঔদাস্য প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার জের আর কিছুতেই যায় না। সব আধি ব্যাধি সারাইয়াছে, ফাগুনের প্রীতিকর রবির করও মৃদুমন্দ মলয়ানিল।

বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ একবার মার্কিন দেশে কোন এক সভায় মনে হয় এই ভাবের একটা কথা বলিয়াছিলেন,—ভারতে ধর্ম্ম প্রচারক পাঠাইবার প্রয়োজন নাই; ধর্ম্মের অভাব ভারতে নাই, অভাব হইয়াছে রুটির। যদি ভারতের দুঃখে কাতর হইয়া থাক, যদি যথার্থ সমবেদনা প্রকাশ করিতে চাও, তাহার মুখের গ্রাস কাড়িও না; তাহাকে ক্ষুধার অন্ন খাইতে দাও; তাহার রুটির ব্যবস্থা কর। এই সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও আজ কাতর-

কণ্ঠে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি, ওগো মার্জ্জিত রুচি সুশিক্ষিত সুসভ্য সহুরে বাবু, পল্লীতে অরুগ্ন পাচনের উপাদান যথেষ্ট আছে ; সেইগুলির প্রতি যাহাতে এই গরীব দেশের লোকের দৃষ্টি পড়ে—এইরূপ আন্দোলন এখন করিতে হইবে ; ভেজাল নোংরা খাদ্য খাইয়া সংযমহীন দেশ দিন দিন ব্যাধিজর্জ্জরিত দেহে মৃত্যুর পথে তীরবেগে ধাবমান ; কি উপায়ে আবার লোক সংযম শিক্ষা করিতে এবং বিশুদ্ধ ঘৃত, দুগ্ধ, ময়দা, তেল ও চিনি পাইতে পারে, তাহার সম্যক আলোচনা এখন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আর সুন্দর সুন্দর শিশি বোতলে ভরিয়া নূতন নূতন ঔষধ পাঠাইয়া দরিদ্র সরল অশিক্ষিত পল্লীর কষ্টের কড়ি ফাঁকি দিয়া লইবেন না। শুধু ঔষধে আর ফল হইবে না ! অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া কত ঔষধ পাঠাইলেন, কিন্তু রুগ্ন পল্লীর হাড়ের জ্বর একবারে ছাড়িল না, অথচ ধনে প্রাণে বেচারারা মরিল। কাঙ্গালের ধন ভুলাইয়া লইতে কি কাহারও প্রাণে বাজে না ! অহো মায়াবিনি-বর্ত্তমান সভ্যতে ! ধন্য তোমার কঠিন প্রাণ। আত্মরক্ষা ও স্বার্থসেবার জন্য সামান্য একটু ঔষধ পাঠাইয়া পল্লীগুলিকে আর কই-মাগুরের মত জীয়াইয়া রাখিবেন না। দীন পল্লীর ক্ষীণ আহ্বানে দয়া করিয়া একটু কর্ণপাত করুন। মরার উপর আর খাঁড়ার ঘা দিবেন না। মনভুলান কাগজের বাক্সের ভিতর চমৎকার শিশি বোতলে ভরিয়া নানাবর্ণের নয়নাভিরাম ঔষধ পাঠাইয়া আর জীর্ণ পল্লীর রক্তশোষণ করিবেন না। ম্রিয়মাণ গ্রামগুলির প্রতি যদি সত্যই আপনাদের লক্ষ্য পড়িয়া থাকে. যদি পল্লীর জীবনরক্ষা যথার্থই সহরের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, যদি বাস্তবিক আপনাদের প্রাণ—পল্লীর জন্য কাঁদিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনাদের শক্তিসামর্থ্য, বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানালোকদানে পল্লীর পুঞ্জীভূত অজ্ঞান তিমির নাশ করুন ; একটু অকৃত্রিম প্রেম, প্রাণের সহানুভূতি ও চোখের জল পাঠাইয়া দেখুন, নির্জ্জীব পল্লী আবার সজীব হইয়া উঠে কি না। অশ্রুর বাড়া সঞ্জীবনী সুধা আর আছে কি ? স্বার্থ মূলক সভ্যযুগের ব্যবসায়িক চাতুরী ও রাজনৈতিক কৌশল ছাড়িয়া একটু আন্তরিক সহৃদয়তা ও প্রাণবত্তা পাঠাইয়া দেখুন. শ্রীহীন পল্লী আবার সুখ সমৃদ্ধি লাভ করে কি না।

হাড় থাকিলেই মাষ লাগে। ভাদ্র হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ছয় মাসকাল রাক্ষসীর সহিত লড়িয়া পল্লীর হাড় কয়খানা ছিল, এখন মাষ লাগিয়াছে ; মাথায় নূতন চুল উঠিয়াছে ; সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর আর মুখ তিক্তবোধ হয় না ; ক্ষুধার জোর হইয়াছে ; পাঁজরে শীত শীত ভাবটা গিয়াছে ; মাথা ডিঙ্গাইয়া একটু গরম জল ফেলিয়া আর স্নান করিতে হয় না ; দীঘি-পুকুর বা নদীর শীতল জলে অবগাহন সহ্য হইয়াছে : শাক অম্ল কলাইয়ের ডাল খাইতে আর তেমন ভয় হয় না ; এক কথায়, অসুখে নিজের দেহ যেন নিজের নহে, এইরূপ হইয়া গিয়াছিল, এখন সে ভাবটা গিয়াছে, বহুদিন রোগভোগের পর নানাবিধ ঔষধ সেবনে গায়ের বদরক্ত সব খোস পাচড়া-চুলকনার আকারে বহির্গত হইতেছে। আজ ফাগুনে হাওয়ায় নবজীবন লাভ করিয়া মাঠে-ঘাটে তাই কৃষক

রাখাল মহানন্দে মেঠোসুরে গ্রাম্য কবিতায় গান ধরিয়াছেঃ—

চুলকনার জ্বালাতে মোলাম সজনি।
সর্ব্বশরীর জড় সড় করে,—চুলকে পড়ে রসানি।
মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো সবার গায়ে চুলকনা,
কাপড় চোপড় নোংরা হ'ল, কাচ্‌তে চায়না
ধোপানি ॥
শত শত চুলকনা হোক, খোস পাঁচড়ায়
কাতর নই,
কিন্তু পীলে-লিবর-ম্যালেরিয়ার কম্প মোরা
খুব জানি ॥

যাহারা নিতান্ত বেরসিক ও কৃতঘ্ন তাহারাই ফাগুনের গুণ মানে না। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিতে হইলে অবশ্যই বলিতে হয় যে, চুলকনার দ্বারা ফাগুনে হাওয়া রোগীর দেহে সঞ্চিত সমস্ত ক্লেদ বাহির করিয়া দেয়। বুদ্ধিমান লোকেরা নিম, বেগুন খাইয়াও উত্তমরূপে খাঁটি সর্ষপতৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক নদীতে বা ভাল পুকুরে স্নান করিয়া খোস-চুলকনার হাত এড়াইতেছে। ফল কথা, ভগবানের নিকট পল্লীবাসীর করুণ ক্রন্দন পঁহুছিয়াছে, তাহাদের প্রাণের আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে; ঈশ্বর কৃপায় পাকা ভাঁসা অনেক রোগী আবার আধবছর অর্থাৎ আগামী শ্রাবণের শেষতক Extension বা পরমায়ু বৃদ্ধি পাইল।

সমালোচনা।

[কবিরাজ শ্রীইন্দু ভূষণ সেন গুপ্ত ভিষগরত্ন, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী
এ ল, এ, এম, এস, এচ্ এম্ বি]

—:০:—

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম গৃহ পঞ্জিকা।

ডাঃ শ্রীযুত কার্ত্তিক চন্দ্র বসু এম, বি সম্পাদিত মূল্য ৶১০ পয়সা মাত্র। ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পঞ্জিকা বলিলে আমরা যেমন গুপ্তপ্রেস বা বঙ্গবাসী পঞ্জিকা মনে করি, এই পঞ্জিকা সে ধরণের নহে, ইহা গৃহস্বাস্থ্যরূপ ধর্ম্ম পঞ্জিকা। ইহার উদ্দেশ্য বাঙ্গালীকে স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নশীল করা, এক কথায় বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা।

ই হাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় অতি সুন্দর ভাবে সংযোষিত হইয়াছে। "হর-পার্ব্বতী সংবাদ" বলিলে আমরা কেবল গ্রহ নক্ষত্র ও বর্ষফলই বুঝি, ইহার সে ধরণের হর পার্ব্বতী সংবাদ নহে। ইহাতে 'দেশের দুরবস্থার কথা,' 'দুরবস্থার কারণ', 'বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য হীনতার কারণ' তাহার প্রতিকারের উপায়', 'গৃহীর কি কর্ত্তব্য ও কি অকর্ত্তব্য,' 'রোগচর্য্যার রীতি', 'চিকিৎসকের কর্ত্তব্য,' 'চিকিৎসার পদ্ধতি' প্রভৃতি বিষয় অতি সুল-

লিত পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, শত শত ভারত গানে যাহা হইবার নহে "এই পুস্তকের 'হর পার্ব্বতী সংবাদের" এক একটী ছড়ায় তদপেক্ষা সহস্রগুণ উপকার হইবে। বাঙ্গালী যদি এই ছড়াগুলি মুখস্থ করিয়া ইহাতে লিখিত উপদেশ পালন করে, তাহা হইলে বাঙ্গালীর পুত্র কন্যায় অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে, বাঙ্গালী আবার তাহার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে। ইহাতে যে সমস্ত মুষ্টিযোগ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেশের স্ত্রীলোকেরা তাহাদের পুত্র কন্যাদের চিকিৎসা আপনারাই করিতে পারিবেন। বাস্তবিক বলিতে কি, এই পঞ্জিকা খানি পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ইহাতে দিন পঞ্জিকা যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাও সুন্দর হইয়াছে। কার্ত্তিক বাবু স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যাহা করিতেছেন তাহাতে তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। কার্ত্তিক বাবুর জয় হো'ক, তিনি বাঙ্গালীকে স্বাস্থ্যবান করিয়া তুলুন, ইহাই আমরা কামনা করিতেছি।

পথ্যাপথ্য বিচার।

(ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসু কাব্যবিনোদ-সাহিত্যভূষণ।)

—:•:—

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে—

বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্য বিহীনস্ত ভেষজানাং শতৈরপি॥

অর্থাৎ ঔষধ ব্যতীত কেবল একমাত্র পথ্যের দ্বারাই ব্যাধি প্রশমিত হইতে পারে, কিন্তু কুপথ্যাচারীর শত শত ঔষধ সেবনেও আরোগ্যের কোন সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমানে কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি, এলোপাথি, হাকিমী প্রভৃতি নানা মতের চিকিৎসার প্রচলন হইয়া যেমন অনেক সময়ে চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটিয়া রোগী অশেষবিধ কষ্ট পাইয়া অকালে প্রাণ হারায়, সেইরূপ যে চিকিৎসকের নিকট পথ্যাপথ্যের বিচার নাই, তাহার হাতেও রোগীর কষ্টের সীমা থাকে না। আয়ুর্ব্বেদের মূল গ্রন্থে যে সব পথ্যের নির্দ্দেশ আছে, বর্ত্তমানে প্রচলিত পথ্যের সহিত তাহার সর্ব্বত্র মিল নাই, বাস্তবিক দেশ, কাল পাত্রভেদে উভয়ের মধ্যেই এরূপ অসামঞ্জস্য হওয়াই স্বাভাবিক। মূলগ্রন্থে সাগু, এরারুট ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায় না অথচ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উহা প্রচুর পরিমাণে চলিতেছে, কিন্তু যে চিকিৎসক কোথায়, কোনটি কি ভাবে চালাইতে হইবে তাহা জানেন না, পথ্যের দোষে তাঁহার হাতে রোগীর ভোগ কাল যে বাড়িয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। ত্রিকাল দর্শী মুনিঋষিগণের নির্দ্দিষ্ট অধিকাংশ পথ্যের ব্যবহার এখন নাই, যে গুলি ব্যবহার হইতে পারে তাহাও পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত ডাক্তার বাবুরা ঘৃণাবোধে ব্যবহার করিতে চাহেন না। অনেকে পথ্যের প্রস্তুত প্রণা-

শীতে গৃহস্থও বিরক্ত হইতে পারেন। উনিশ গুণ জলের মধ্যে এক বাটি চাউল দিয়া তাহাকে মৃদু সন্তাপে জ্বালাইতে জ্বালাইতে অন্নমণ্ডে পরিবর্ত্তিত করা কিছু সময় সাপেক্ষ।

অনেক এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা পথ্যের উপর যে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন না, তাহার প্রমাণ বহুস্থলেই পাওয়া যায়, আমি নিজে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করি, জনৈক অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ সাব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনের গৃহ চিকিৎসক রূপে তাঁহার পৌত্রের টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসা কালে আমার অসাক্ষাতে নানাবিধ ফল ফুলুরির ব্যবস্থা করিতে দেখিয়াছি। অতিরিক্ত পরিমাণে ফল ফুলুরী না দিলে (কারণ অন্তকোন পথ্যের উপর রোগীর রুচি নাই) রোগী হার্টফেল করিয়া মারা যাইতে পারে, এইরূপই তাঁহার মত। ন্যাসপাতি ফলের গুণাগুণ বিশেষ জানি না, কিন্তু আমার ধারণা, যেখানে ন্যাসপাতি চলে পথ্যরূপে সে স্থানে বিলাতি আমড়াও চালানো যায়, জানি না আমার এ ধারণার কিছুমাত্রও সত্যতা আছে কিনা। এক দিন তাহাদের এক M. B. আত্মীয় আসিয়া বলিয়া গেলেন, রোগীকে প্রচুর পরিমাণে ডাবের জল পান করিতে দাও, রোগীর ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। ডাক্তার বাবু (গৃহস্থ) আমার মত চাহিলেন, আমি আশ্চর্য্য হইলাম তিনি বলিলেন, কবিরাজের ন্যায় তোমরাও রোগীদের পথ্যদিতে বড় ভয় পাও। ডাবের জলে পেটটী ঠাণ্ডা থাকিবে, ভয়ের কি কারণ আছে? আমি বলিলাম শারীরিক ধর্ম্ম সকল একরূপ নহে মহাশয়! আপনি একসঙ্গে পাঁচটী ডাবের জল খাইয়া সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু সামান্য একটু ডাবের জল পানে আমার তৎক্ষণাৎই সর্দ্দি লাগিয়া বসে, ইহার পর তিনি আর কোন কথা বলেন নাই।

আর একটী রোগীর কথা মনে আছে, দুবৎসরের ছেলে, আমরক্ত এবং জ্বর, কিন্তু আমাশয়ের সূত্রে জ্বর নহে, দু'টী ভিন্নভাবে একই রোগীকে আশ্রয় করে। জ্বর ম্যালেরিয়া ঘটিত, শীত করিরা আসিত, কয়েক ঘণ্টা ভোগের পর ঘামদিয়া হয়ত একেবারেই ছাড়িয়া যাইত, নতুবা খুব অল্পই থাকিত। চিড়ার জল উদর পীড়ার পক্ষে উত্তম পথ উহা পাকস্থলীকে ঠাণ্ডা করে। Soothing to the Stomach রোগীকে যেদিন চিড়ার পথ্য দেওয়া হইত সেদিন রস বেশ কমিয়া যাইত, কিন্তু জ্বর বাড়িত, অন্যপক্ষে হর্লিকস্ মিল্ক পথ্য দিলে জ্বর সমভাবে থাকিয়া দাস্ত খুব বাড়িয়া যাইত, এক্ষেত্রে ৫।৬ দিনের জন্য তাহার উপযুক্ত পথ্যই ঠিক করিতে পারিলাম না। অবশেষে বেলশুঁট্ সহ চিড়াসিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ প্রয়োগে রোগী ক্রমে ভাল হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

ধর্ম্মাভাবই ধ্বংসের হেতু।

সাধারণতঃ পল্লীগ্রামসমূহের অবনতির কতকগুলি স্থূল কারণের কথা আমরা বহুবারই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। পল্লীগ্রামে বিস্তর বাটীই ক্রমে জনশূন্য হইয়া আসিতেছে, বহু বংশই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে; যাহারা জীবিত আছে, তাহারা প্রায়ই অনেকে জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছে। কেন এরূপ হইতেছে, তাহার সূক্ষ্ম মর্ম্ম কয়জন দেশহিতৈষী আন্তরিক ভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন? কিন্তু এই বিষয়টাই ইঁহাদের সর্ব্বাদৌ বিশেষরূপেই আলোচ্য। আমাদের মনে হয়, পল্লীগ্রামে—কেবল পল্লীগ্রামেই কেন, সহরেও যে ইদানী এত অধিক রোগের প্রাবল্য হইতেছে,—ধর্ম্মাভাবই ইহার মুখ্য হেতু। পল্লীগ্রামের এবং সহরের সর্ব্বত্রই সাধারণতঃ ধর্ম্মাভাব শোচনীয় রূপেই পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার ফল,—অসংযম, অনাচার এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে বা অংশিকরূপে অবসাদ। তাহার ফল—নানাপ্রকার আধি-ব্যাধির অতি প্রাবল্য। দুই চারিটী দৃষ্টান্ত দিয়া এ কথাটা ভালরূপে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য; কেবল হিন্দু কেন, অপর সকল জাতীয় ব্যক্তিরই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরণ বহু প্রকারেই আরামপ্রদ, স্বাস্থ্যজনক এবং ধর্ম্মাচার-পরিব্যঞ্জক। ইদানী ইহা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। যাহাদের নিত্য মজুরী বা প্রাতঃকালীন ব্যবসায় কর্ম্মাদি বাধ্যতামূলক,—তাহাদের পক্ষে প্রাতরুত্থান অপরিহার্য্য বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত প্রায় সকলেই দিবা আটটা, নয়টা বা কোন কোন স্থলে বেলা দশটা পর্য্যন্ত নিদ্রা গিয়া থাকেন। ইহা অত্যন্ত আয়ুহানিকর। এত অধিক বেলায় শয্যা হইতে উঠিয়া অনেকেরই ধর্ম্মকৃত্য ও প্রাতঃকৃত্যের অনুষ্ঠান প্রায়ই সম্ভবপর হইয়া উঠে না; অনেকে বাসি মুখেই চা-বিস্কুট ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এটা প্রায়ই সহরবাসীর পক্ষে প্রয়োজ্য হইলেও, পল্লীবাসিগণের ভিতরও ইদানী এই অভ্যাস প্রবলরূপে দেখা দিতেছে। পল্লীগ্রামবাসী বহু ব্রাহ্মণেরই ত্রিসন্ধ্যা করা'ত দূরের কথা, দিনান্তে একবার গায়ত্রী পাঠও বোধ হয় হইয়া উঠে না। ব্রাহ্মণের যখন এতদূর অধঃপতন, তখন তদ্দৃষ্টান্তে অপরাপর শ্রেণীর ধর্ম্মকৃত্য কতদূর পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রাতঃকালের ব্যাপার যেমন দাঁড়াইয়াছে, তেমনি দিবাদণ্ডের বা রাত্রি দণ্ডের অপরাপর কৃত্যও ক্রমেই কিরূপ অনাদৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে। দিবা রাত্রির ভিতর অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠান ত একরূপ বর্জ্জিত হইয়া আসিতেছে। ইহার ফল কেবল পারলৌকিক হিসাবে নহে,—ইহলৌকিক হিসাবেও—স্বাস্থ্যরক্ষাদি সম্বন্ধেও যে অত্যন্ত শোচনীয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আহার-বিহারাদি সম্বন্ধেও সংযমের কোন লক্ষণই প্রায় আর দেখা যায় না। কোন্ তিথিতে কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ প্রশস্ত বা নিষিদ্ধ, তাহা আর মানিয়া চলা ত হয়ই না, পরন্তু এরূপ নিয়ম কুসংস্কারমূলক বলিয়া অনেকের

ধারণা হইতেছে। আহার-ঘটিত এইরূপ এবং নানারূপ অনাচারেও যে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ গুরুতররূপ হইয়া আসিতেছে, ইহা কি আর অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে? নিষিদ্ধ দ্রব্যের আহার যেরূপ বাড়িয়াছে, রোগ-প্রবণতা তেমনই বৃদ্ধি পাইতেছে, ফলে জীবনীশক্তি এবং ব্যাধি-বর্জ্জনের দৈহিক শক্তিও তেমনি হ্রাস পাইতেছে। এ সম্বন্ধে পল্লীবাসিগণ অপেক্ষা সহরবাসিগণের অত্যাচার যে অধিকতর, তাহা নিত্যই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। সহরের অধিকাংশ "ইটিং হাউজ" বা ভোজথানা যে বহু বিষ-দূষিত খাদ্যদ্রব্যের আগার, তাহা অনেকেই দেখিতেছে এবং জানিতেছে; তথাপি এমনই প্রলোভন যে, তাহাতেও অনেকের পক্ষে সাবধান হইয়া চলা দুরূহ হইয়া পড়িতেছে। সেই চা-কেক-বিস্কুট—সেই কোর্ম্মা-কাবাব-কোপ্তা—সেই চপ চকোলেট-কফি—এই সব যেন না হইলে আর চলিতেছে না! সাধারণতঃ এই সকল দ্রব্য কতটা পরিমাণে দেহের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণজনক, তাহা ভাবিবার অবসর অনেকেরই আদৌ হয় না; কোনরূপে ইহা গো-গ্রাসে গিলিতে পারিলে হইল! ধারণা—তাহা হইলে ভোজনকারীর শরীরের অবস্থা ক্রমেই উত্তম হইতে উত্তমতর হইতে থাকিবে। অধিকাংশ ময়রার থাবারই নানারূপ দূষিত পদার্থে প্রস্তুত। অথচ, ইহাও অনেকেরই নিত্য ব্যবহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে-কালের ব্যবস্থা মুড়ি-গুড় বা মুড়ি-নারিকেল-নাড়ু ইদানী অনেকেরই পক্ষে আর কালোচিত বাবু-ভোজ্য বলিয়া পরিগণিত নহে। এই সব নানারূপ অমেধ্য এবং দূষিত সামগ্রী ব্যবহারে ধর্ম্মহানি—সুতরাং জীবনীশক্তির অপচয় যে নিত্যই যথেষ্টরূপ হইতেছে, তাহা কি আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে? তথাপি অনেকেরই চৈতন্যোদয় হইতেছে না; ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় নহে কি?

ধর্ম্মাভাবের আর এক শোচনীয় লক্ষণ—নিত্য ব্যবহার্য্য প্রায় সামগ্রীতেই ভেজালের অতি বৃদ্ধি। অর্থের অত্যধিক লোলুপতায় বহু অর্থ-গৃধ্নু ব্যবসায়ীই প্রায় সকল দ্রব্যেই ভেজাল মিশাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘৃত দুগ্ধ, চাউল, ময়দা, তৈল—কত নাম করিব? —অধিকাংশ দ্রব্যই আর বিশুদ্ধ প্রকারের পাইবার উপায় নাই। ময়দার সূক্ষ্ম শ্বেত প্রস্তরের চূর্ণ মিশাইয়া দেওয়া হইতেছে;—ঘৃতে নানাপ্রকারের অস্পৃশ্য চর্ব্বি ভেজাল দেওয়া হইতেছে;—এই সকল বিষম দূষিত সামগ্রীর ব্যবহারে দেশ যে এখনও একবারেই জনশূন্য হয় নাই, ইহাই বিচিত্র বলিতে হইবে। একেত সকল দ্রব্যই অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য, তাহার উপর অধিকাংশ দ্রব্যই ভেজালে পরিপূর্ণ;—ইহাতে যে মানবদেহ বিবিধ ব্যাধির আধার হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? অনেককে বাধ্য হইয়া এই ভেজাল দ্রব্যই ব্যবহার করিতে হইতেছে,—ফলে ইহারা নানারূপ ব্যাধির কবলগত হইয়াও চির জীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে। এই ভেজালের অতি প্রাবল্যও ধর্ম্মাভাবেরই পরিচায়ক। যাহার অন্তরে বিন্দুমাত্রও ধর্ম্ম-বুদ্ধি আছে, তাহার পক্ষে এরূপ কার্য্য করা কোনক্রমে সম্ভবপর হইতে পারে? দেশের দিকে না চাহিয়া চক্ষু বুজিয়া অনেকেই ভেজালের কারবার চালাইতেছে;—ভাবি-

তেছে না,—ইহাতে তাহারা দেশের কি পরিমাণ অনিষ্ট করিতেছে! দেশে যে নানাবিধ রোগের এত বৃদ্ধি,—এই ভেজালও ত তাহার একটা মুখ্য কারণ। সহরের কথা ছাড়িয়া দিই,—কেবল পল্লীগ্রামের কথা যদি ধরা যায়, তাহা হইলেও পল্লীগ্রামসমূহের রোগের প্রাবল্য দেখিয়াও দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। বঙ্গের স্বাস্থ্যবিভাগের ১৯২২ সালের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ,—এই সালে বঙ্গের পল্লীগ্রাম সমূহে—

কলেরায় মরিয়াছে	৭৩,৯,৪৩ জন।
বসন্তে ,,	৭,৮,৩৫ জন।
কালাজ্বরে ,,	৯,২৬ জন।
ম্যালেরিয়ায় ,,	৭৩৭,৩,২৩ জন।
সর্ব্ববিধজ্বরে ,,	১০,৪৬,৬,৬১ জন।
আমাশয়ে ,,	১৩,৭,৪৮ জন।
ইনফ্লুয়েঞ্জায়	২,৮,০,৯ জন।
নিউমোনিয়ায়	৫,৭,৬১ জন।
যক্ষায় ,,	১,৩,৯৪ জন।

সমগ্র পল্লীগ্রামসমূহে মোট অধিবাসীর সংখ্যা ১৯১২ সালে ৪ কোটী ৩৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৭ শত ৮৭ জন;—বৎসর বৎসর যদি এইরূপই ভাবেই ইহাদের উপর রোগের আক্রমণ হইতে থাকে, তাহা হইলে পল্লীগ্রাম সমূহের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন যে অচিরেই অবশ্যম্ভাবী, ইহা দূরদর্শী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। অথচ পল্লীবাসিগণ অনেকেই যে এ বিষয়ে একবারে বিবেচনাশূন্য, তাহাও ভালরূপই বুঝা যাইতেছে। বিবেচনা-শক্তি বিন্দুমাত্র থাকিলেও কি কেহ স্ব স্ব দেহ এবং জীবন রক্ষায় সময়োচিত ব্যবস্থা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? এই যে নিশ্চেষ্টতা নৈরাশ্য বা অবসাদ—ইহাও ধর্ম্মাভাবের হেতুভূত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। আধুনিক কুশিক্ষা এবং কু-আদর্শের ফলে দেশে নিত্য এবং নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। আধুনিক বিকৃত শিক্ষার অভাবে হিন্দু গৃহস্থের গৃহে আর পূর্ব্ববৎ দেবার্চ্চনাদি দেখিতে পাইবেনা;—কুলদেবতা এখন অনেক স্থলেই দায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; গৃহস্থ ব্রাহ্মণ স্বয়ং অনেক স্থলেই গায়ত্রীবর্জ্জিত—সন্ধ্যা বর্জ্জিত, ধর্ম্মবুদ্ধি মাত্রই বর্জ্জিত। প্রাতে উঠিয়াই চা-বিস্কুট প্রভৃতি আহারে অভ্যস্ত; আর অপরদিকে কুল-দেবতার পূজার ভার একজন প্রায় নিরক্ষর ব্যক্তির উপরই বেতন-ব্যবস্থায় সমর্পিত—এরূপ স্থলে অনেক ক্ষেত্রেই গৃহদেবতা প্রায়ই যথাবিধি নৈবিদ্যে বর্জ্জিত হইয়াই নাম মাত্র অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি দেবতার সেবায় সংন্যস্ত থাকিলেও—অনেক স্থলেই বিগ্রহের যথোচিত সেবা প্রায়ই ঘটে না, এজমালির সংসারে বিগ্রহও ভাগে পড়িয়া নানারূপ দুর্ভোগের অধীন হয়েন; ইহাতেই গৃহস্থের কল্যাণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সেবাইত,—সম্পত্তির এবং শিশ্নের সেবা করিতেই বিব্রত,—কামিনী-কাঞ্চনের মায়ায় অতিমাত্র মসগুল; ফলে পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ অনাদরে অপূজিত, বা স্থলবিশেষে জাহ্নবীজীবনে নিক্ষিপ্ত;—মন্দির বিভগ্ন,—বট অশ্বত্থাদি বৃক্ষে সংবেষ্টিত,—এরূপ শোচনীয় দৃশ্য বঙ্গে আজকাল বিরল নহে। ইহার উপর যজ্ঞহোমাদির বা অতিথি সেবাদির কথা আর না তুলিলেও চলে! অধিকাংশ বাটীতেই

অতিথি ভিক্ষুক প্রায়ই অর্দ্ধচন্দ্রেই আপ্যায়িত হইয়া থাকে। এই সব ধর্ম্মাচারের অভাবে বহু গৃহস্থের গৃহ—বহুসংখ্যক গ্রামই আজ শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই সব ধর্ম্মাচারের অভাব ইদানী সরল প্রকৃতির অত্যন্তাভাব ঘটিতেছে; অধিকাংশ লোকেই ক্রূর, কপট এবং ঘোরতর স্বার্থপরহইয়া উঠিতেছে। দেবদ্বিজে ভক্তি খুবই কমিয়া আসিতেছে। গো সেবা আর পূর্ব্ববৎ নাই বলিলেই চলে। বৃদ্ধ পিতা-মাতা গলগ্রহ হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে হিন্দু গৃহস্থের গৃহে সর্ব্ববিধ অশান্তি এবং অকল্যাণের আধিক্য হইবে তাহা কি আর বিচিত্র কথা?

ধর্ম্মাভাবের আর এক লক্ষণ, অধিকাংশ হিন্দুর গৃহেই দশ সংস্কারের ভিতর অধিকাংশ সংস্কারেরই রূপান্তরে গ্রহণ বা একেবারেই পরিবর্জ্জন। রূপান্তরে বলিলাম এই জন্ম যে, প্রায়ই দেখা যায়, নামকরণ অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ প্রভৃতি কয়েকটী সংস্কার দ্বিজ পুত্রের উপনয়ন সংস্কার কালেই অতি সংক্ষেপে নামতঃ অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে উদ্দেশ্যে হিন্দুর পক্ষে দশ সংস্কার অবশ্য অনুষ্ঠেয়, ইহাতে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ সাধিত হইতে পারে না। ফলে হিন্দুর দেহে এবং মনে ধর্ম্ম-প্রভাবের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; তামসিক এবং রাজসিক গুণের প্রাবল্য এবং সাত্বিক গুণের অপচয় বা বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে; ইহারই ফল,—ব্যাধির প্রাবল্য, অপমৃত্যু, অকালমৃত্যু, মানসিক অশান্তি, সুখময় সংসারে শ্মশানের বীভৎস দৃশ্য। যদি বাঁচিতে এবং বাঁচাইতে চাও, যদি আবার সত্যই সুখের সংসার পাতিতে এবং পাতাইতে চাও, তবে সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মসেবাই তাহার একমাত্র উপায়—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।

বঙ্গবাসী।

আয়ুর্ব্বেদে সভ্যতা।

(শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী)

আধুনিক যুগে সভ্যতা বলিতে গেলে পাশ্চাত্য অথবা তদনুকরণের কার্য্যকে সভ্যতা বলা হইয়া থাকে। আমরাও পাশ্চাত্য বা তদনুকরণ ভাবকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি। সুতরাং সেই সভ্যতাই আমাদের অনুকরণীয় হইয়াছে। অশনে বসনে, চাল, চলনে, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি—সর্ব্বই পাশ্চাত্য প্রভাব আমাদের প্রতিভাকে পরাজিত করিয়াছে। অধুনা কথিত সভ্যতাই আমাদের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদেও তদ্রূপ সভ্যতা অনুষ্ঠিত হইবেনা কেন?

পূর্ব্বে আমাদের দেশস্থ কবিরাজগণ যে ভাবে রোগী চিকিৎসা করিতেন, যে ভাবে ঔষধ প্রস্তুত করিতেন, এখন কতিপয় বৎসর মধ্যে সে ভাব প্রায় লোপ পাইয়াছে। আগে কবিরাজেরা ছাত্রদের সাহায্য লইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেন, ছাত্রেরা বনে, জঙ্গলে গিয়া ভেষজ সংগ্রহ করিতেন। এখন কোন কোন কবিরাজ ছাত্রদের দ্বারা উদ্যান হইতে ভেষজ সংগ্রহ করিয়া আনেন, কিন্তু সকলে নয়। আগে অনেক কবিরাজের ঔষধ সকল উত্তরিয় বস্ত্রে বাঁধিয়া চলিতেন। রোগী দেখিয়া ঔষধ তাহা হইতেই দিতে পারিতেন। আবার গৃহে যে সকল ঔষধাধার ছিল, তাহা আধুনিক ধরণের ছিলনা, বটিকাদি থাকিত তৈলাদি বাঁশের চোঙ্গায়, তৈলাদি থাকিত মৃৎ পাত্রে। ঐ সকল রক্ষিত হইত বেতের ঝাইল বা পেটরায়। এখনকার মত শিশি, বোতল বা আলমারীতে ঔষধাদি থাকিত না। তখনকার কবিরাজের চেহারাও বসন ভূষণ ছিল প্রধান পণ্ডিতের ন্যায়, এখন কিন্তু কবিরাজেরা বাবু-সাজ ধরিয়াছেন। ডাক্তারদের অনুকরণে রোগীর বুকে কবিরাজেরা সিঙ্গা-সানাই লাগাইয়া থাকেন। জ্বর মাপের কাটি বগলে লাগাইয়া সভ্যতা ফলাইয়া থাকেন। আর রোগী দেখিয়া ব্যবস্থা পত্র দিয়া থাকেন। রোগীর লোক ঔষধালয়ে গিয়া ঔষধ আনিয়া থাকে। কবিরাজী ফরাসে টেবিল, চেয়ার, আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

এই সকল ব্যবস্থা তো সভ্যযুগে হইয়াছে, কিন্তু আগেকার চিকিৎসক অপেক্ষা কবিরাজের কি এখন ভাল চিকিৎসক হইয়াছেন? পাশ্চাত্য সভ্যতা ধরিয়া কি তাঁহারা আগের অপেক্ষা উন্নত হইয়াছেন? সিঙ্গা, সানাই বা মাপকাটি দিয়া তাঁহারা কি বুঝেন? তবে চটকধারীভাব দেখাইবার জন্য যে তাঁহারা এরূপ আচার অবলম্বন করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা ডাক্তারী পড়িয়া কবিরাজী ব্যবসা করেন, তাঁহারা যে এসকল বিষয়ে অভ্যস্থ হইয়াছেন সেবিষয়ে আশ্চর্য্য করিবার কিছুই নাই। যাহ হউক এ সকল হইলেও কবিরাজেরা ডাক্তারদের মত কোট, প্যাণ্ট ব্যবহার করিতে এখনও অভ্যস্থ হন নাই। অনেকেই নিত্য সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আচার গুলিও প্রধান পণ্ডিতদিগের আচার নিহিত হিন্দুভাবে বিশুদ্ধ। যিনি ডাক্তারী পাস করিয়া কিছুদিন কোট, প্যাণ্ট পরিয়া ব্যবসায় করিয়াছেন, তিনি যদি কবিরাজী পড়িয়া সে ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তবে তাঁহাকে কবিরাজী বিহিত আচার সভ্যতা মানিয়াই চলিতে হইবে, বহুরূপীর ন্যায় সাজ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইলে হংসমধ্যে বক সাজিলে চলিবেনা। তথাপি তাঁহার সভ্যতা নিহিত রূপটা থাকিয়াই যাইবে। এলোপ্যাথিদের ন্যায় হোমিওপ্যাথেরাও হাটু কোট পড়েন, কটি সানাই লাগান, রোগী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা দিয়া বাহিরে আসেন। রোগীর অবস্থা বলিতে গেলে তাঁহার চটেন, তাহারা মনে করেন, ভিজিট নিতেই আসিয়াছেন আবার অতিরিক্ত উৎপাত কেন? কবিরাজেরা এই সভ্যতার জোয়ারের মধ্যে পড়িয়াও রোগী দেখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে রোগীর অবস্থা জানিয়া ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কবিরাজরা এ প্রকার করেন না। এ প্রকার অস্বাভাবিক আধুনিক সভ্যতা যাহাতে কবিরাজদের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য যেমন কবিরাজেরা সতর্ক হইবেন, আমাদেরও তদ্রূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কবিরাজেরা আগে নাড়ী দেখিয়া বক্ষ স্পন্দন ও নাড়ীর গতি বুঝিয়া জ্বরের তাপ বুঝিতে পারিতেন এবং অন্যান্য উপসর্গও ধরিয়া লইতে পারিতেন। এখন এই সভ্যতার গুণে সহজ উপায় থাকিতে তাঁহারাও আর বুঝিয়া দেখিয়া আয়ুর্ব্বেদের সে অঙ্গটুকু বাদ দিয়াছেন। আগেকার দিনে কবিরাজেরা নাড়ী দেখিয়া রোগ ও রোগীর অবস্থা বলিয়া যাইতেন, এখনও সেইরূপ করা উচিত নহে কি? তবে এখন তেমন লোক আর জন্মায় না বলিলে চলে। এমন করিয়াও আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন স্মৃতির কার্য্যকালটুকু এখনও লোপ হয় নাই। যাহা হউক পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা যদি কবিরাজগণ ফিরাইতে বা না রাখিতে পারেন তবে কবিরাজী ধ্বংস হইয়া যাইবে। কবিরাজী চিকিৎসা যে আমাদের দেশের জল বায়ুর একান্ত উপযোগী আর ইহার উপকারিতা দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রদ তাহা বহুকালের পরীক্ষায় বুঝা গিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই আধুনিক সভ্যতার বর্দ্ধমান অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদে শল্য চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার উঠিয়া গিয়াছে, কবিরাজেরা তা করেন না, অস্ত্রও রাখেন না। যাঁহারা ডাক্তারী বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া কবিরাজ হইয়াছেন, তাহারাও গঙ্গায় অস্ত্র ফেলিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া কবিরাজী করিতে গিয়াছেন। উঁহারা যদি আমাদেধ প্রাচীন শল্য চিকিৎসার সঙ্গে মিশাইয়া আধুনিক অস্ত্র চিকিৎসা ব্যবসায়ের মধ্যে আনিতে পারেন, তবে আমাদের আর্য্য চিকিৎসার উন্নতি হইবে নিশ্চিত কথা। বাজে কাজে উঁহারা পাশ্চাত্য বিহিত আচার অনুকরণ করেন, কিন্তু যেটুকু অনুকরণ করিলে আমাদের উন্নতি হইবে, তা তাঁরা করেন কই?

কদলীর উপকারিতা।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর

৩১। সয়া কলা। ইহাও একপ্রকার বীচা কলা। ফলের রস নানারূপ চক্ষু রোগে উপকারী।

৩২। সিঁদুরে কলা। দেখিতে ঘোর লাল বর্ণ, মধ্যমাকৃতি, ফল বড়, খাইতে ভাল, ইহাকে চীনা কলাও বলে।

৩৩। বেসিনে কলা। এই কলা বেসিন দেশে জন্মে, স্বাদ অপেক্ষা ইহার

গন্ধ অতি মনোহর; পুষ্প ফেলিয়াও ইহার ঘ্রাণ লইতে ইচ্ছা হয়।

৩৪। রসথলী। মান্দ্রাজে জন্মে, বড়ই সুরসাল, দেখিতে প্রায় চাঁপাকলার ন্যায়।

৩৫। যবদ্বীপে কলা। যবদ্বীপে এক প্রকার আশ্চর্য্য কলা জন্মে, একগাছে, একটী মাত্র ফল হয়, অর্থাৎ সমগ্র মোচাটা যেন জমাট বাঁধিয়া একটী ফলে পরিণত হয়। বাহিরে কলা প্রায় দৃষ্ট হয় না, কাণ্ডের ভিতরেই পুষ্প ও পক হইতে থাকে; সম্পূর্ণ পাকিলে, গাছ ফাটিয়া বাহির হয়। ইহা এত বড় যে, একটী কলায় ৪ জনের পূর্ণ আহার হয়। তথায় আর এক প্রকার কলাগাছ আছে, তাহার পাতার উল্টা দিকে আঘাত করিলে মোমের মত পদার্থ নির্গত হয়, তাহাতে বাতি প্রস্তুত হয়।

৩৬। ফিলিপাইনে কলা। ফিলিপাইন দ্বীপে তদপেক্ষাও ১টী বড় কলা এক গাছে উৎপন্ন হয়, ইহা এত ভারি যে, ঠিক ৪ জনের বোঝা।

৩৭। বেগুনে কলা ইহা পশ্চিমে ভারতীয় দ্বীপে উৎপন্ন হয়, দেখিতে ছোট, খাইতে খুব সু-স্বাদু। তত্রত্য বড় লোকেরা ইহা অত্যন্ত ভালবাসেন।

৩৮। ওরক্কো। আমেরিকায় "ফ্লোরিজ" দেশে ওরক্কো নামে এক প্রকার কলা হয়, ইহা গাছে পাকিলে ইহার সদ্গন্ধ এতই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় যে, শুধু মানুষ কেন, পশুপক্ষীরাও তদ্দ্বারা উন্মত্ত হইয়া ছুটিতে থাকে।

৩৯। কাষ্ঠ কদলী। বাঙ্গালায় বুনো-কলা, ও মহারাষ্ট্র দেশে কাষ্ঠকলা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সুকাষ্ঠা, বনকদলী, কাষ্ঠিকা, শিলারম্ভা, দারুকদলী, ফলাঢ্যা, বনমোচা ও অশ্মকদলী। ইহা অতিশয় মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, দুর্জ্জর, অগ্নিমান্দ্যকারক এবং তৃষ্ণা, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র রক্তপিত্ত, বিস্ফোটক ও অস্থিরোগে উপকারক।

৪০। সুবর্ণকদলী। চাঁপাকলা নামক প্রসিদ্ধ কদলী বিশেষের নাম সুবর্ণ কদলী। উৎকলে ইহাকে পাটোয়া এবং কোঙ্কন দেশে সোণে কেলা কহে। ইহা মধুরস, শীতল, অম্লবর্দ্ধক গুরুপাক, শুক্রজনক, কফকারক এবং দাহ ও তৃষ্ণার নিবারণ কারক।

কদলী পুষ্প (মোচা)

কদল্যাঃ কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরংগুরু।
বাতপিত্তহরং শীতং রক্তপিত্তক্ষয়প্রণুৎ॥
তৃষ্ণা প্লীহ জরংহন্তি দীপনং বস্তিশোধনম্।
বহুমূত্রাপহং হৃদ্যং শুক্রকৃদ্বলবর্দ্ধনম্॥
কফহৃৎ মূত্রদোষঘ্নং রজকৃচ্ছ্রাতিনাশনম্॥
সোম রোগং নিহন্ত্যাশু তৃপ্তিদং মুনর্ভিমতম্॥

কদলী পুষ্প বা মোচার গুণ।

মুনিগণ বলিয়াছেন, কদলী পুষ্প স্নিগ্ধ, মধুরকষায়, বাতপিত্ত নাশক, শীতল, রক্তপিত্ত এবং ক্ষয় রোগ নাশক, তৃষ্ণা, জ্বর, বহুমূত্র, মূত্রদোষ, রজকৃচ্ছ্র, সোমরোগ বিনাশক, তৃপ্তিদায়ক, কিঞ্চিৎকফবর্দ্ধক, হৃদ্য, শুক্র ও বল বৃদ্ধিকারী, দীপন এবং বস্তিশোধনকারী গুণ বিশিষ্ট।